সেবা রহস্য

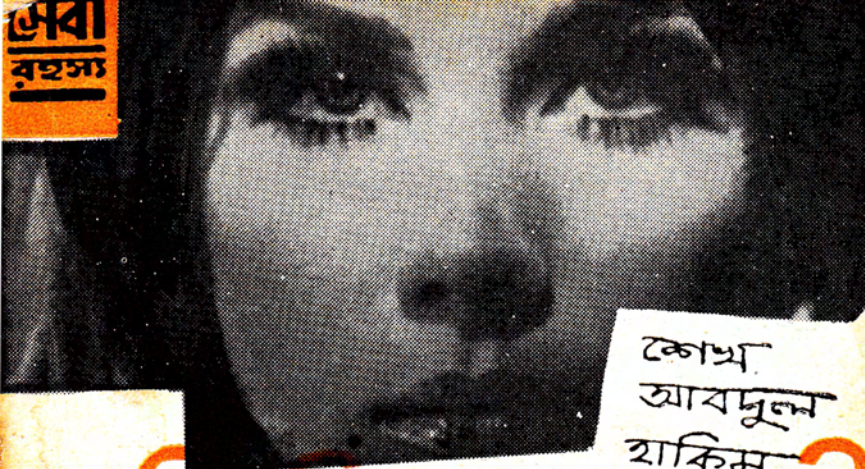

শেখ আবদুল হাকিম

আমি কি হত্যাকারী

আমি কি হত্যাকারী

আমি কি হত্যাকারী

আমি কি হত্যাকারী

আমি কি হত্যাকারী

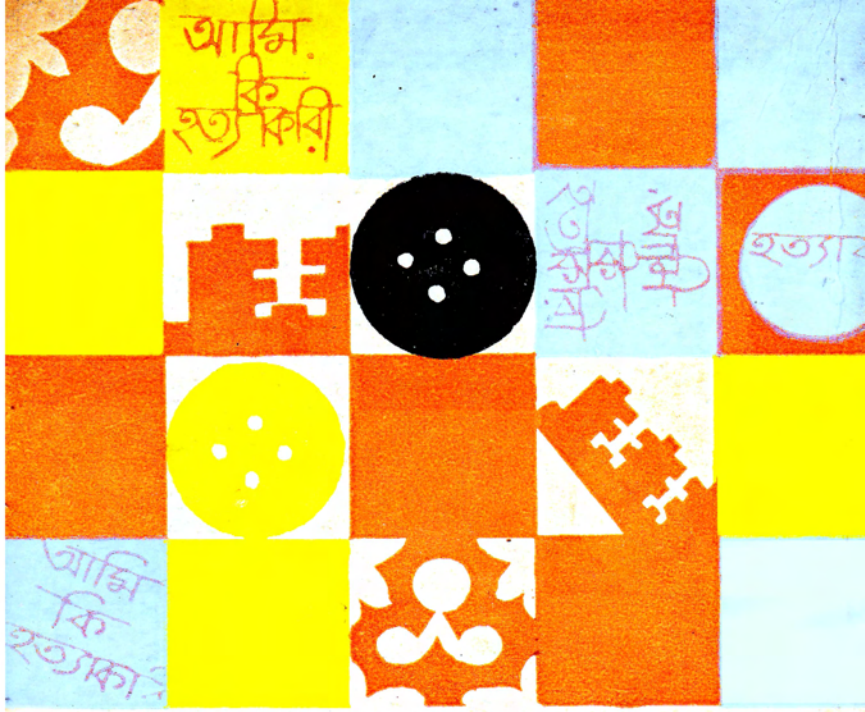

ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, অপরিচিত এক বাড়ীতে নির্মম ভাবে হত্যা করছি আমি অপরিচিত এক লোককে।··· লাশটা লুকিয়ে ফেললাম। একটা আলমারীর ভিতর ঢুকিয়ে চাবী লাগিয়ে দিয়ে পকেটে ফেললাম চাবীটা। পালাচ্ছি এবার।··· ঘুম থেকে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, ব্যাপারটা তাহলে দুঃস্বপ্ন—সত্য নয়।··· কাজে যাচ্ছি। দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে পকেটে হাত দিতেই বেরিয়ে এলো সেই চাবীটি! আশ্চর্য! স্বপ্নে দেখা সেই আলমারীর চাবী!! আমি কি হত্যাকারী?

সেবা রহস্য

৮

সেবা
রহস্য

আমি কি হত্যাকারী

লিখেছেন

শেখ আবদুল হাকিম

প্রকাশিকা :
ফরিদা ইয়াসমীন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

সেগুনবাগান প্রকাশনী কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ১৯৭০

প্রচ্ছদ : শাহাদত চৌধুরী

কাহিনী
বিদেশী গল্প অবলম্বনে

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
ফোন : ২৫৫৩৩২

শো-রুম :
মাসুদরানা বুকষ্টল
ষ্টেশন রোড
চিটাগাং।

মূল্য : ২·০০ টাকা মাত্র

এক

ভাঁজ ভাঁজ অন্ধকারে, ভাঁজ ভাঁজ কালচে অন্ধকারে, এই ঢেউ খেলানো মায়াময় আলো-আঁধারিতে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি শুধু একটি মুখ। শুধু একটি আলোকিত মুখ। যেন সাদাটে, স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরা একটি মুখ। নিখুঁত, সুশ্রী, সুন্দরী যুবতীর একটি মুখ। সর্বত্র ভেসে ভেসে, যেন সাঁতরেসাঁতরে বেড়াচ্ছে। ভাঁজ ভাঁজ আলো-আঁধারিতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একাকী।

কোথা থেকে বলতে পারব না, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোথাও থেকে এক টুকরো রহস্যময় আলো নিরবচ্ছিন্নভাবে ওর মুখে এসে পড়েছে। নীচের দিক থেকে উঠে এসে ওর মুখটায় পড়ছে সেই আলো। অদ্ভুত, মায়াময়, আশ্চর্যজনক সুন্দর দেখাচ্ছে। বৈচিত্র্যময়, রহস্যময় এবং সেই সাথে অবাস্তব মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। আর আমার বুক ভীষণভাবে দুলছে।

আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু ভয় কোথাও দেখছি না। শুধুমাত্র লম্বাপানা, সাদাটে আর স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরা মুখটা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশপাশে কোথাও না কোথাও যেন রক্ত হিম করা বিকট একটা বিপদ ওত পেতে রয়েছে, আমি অনুভব করতে পারছি পরিষ্কারভাবে, যেন দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। এবং সেই বিপদের

হাত এড়িয়ে যাওয়া যেন আমার সাধ্যের অতীত ব্যাপার। উপলব্ধি করছি এই মূহূর্তে কি করা উচিত আমার, কি করতে হবে আমাকে। যেন সেটা না করে বিকল্প কিছু করার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও সেটা করছি না—ভয়ে!

আমি একান্তভাবে চাইছি ঘুরে দাঁড়াতে। দৌড়ুতে। অদৃশ্য হয়ে যেতে। পালাতে। আমি চাইছি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠতে। পড়িমরি করে এসব কিছু থেকে বেমালুম উবে যেতে।

সেই চেষ্টাই, সেই পালাবার চেষ্টাই করলাম। অবশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি এবং দৈহিক শক্তি ব্যবহার করে ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস পেলাম। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই দেখতে পাচ্ছি একটা নয়, অনেকগুলো দরজা। মোট চারজোড়া, আটটা দরজা। একটার পর একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানে কোনোরকম জায়গা নেই, দেয়াল নেই—ঘেঁষা-ঘেঁষি করে রয়েছে দরজার ফ্রেমগুলো। অথচ এই ঘরে প্রবেশ করবার সময় একটা মাত্র দরজা দেখেছিলাম আমি। সেটা দিয়ে ঢুকেছিলাম, অনায়াসেই।

একটা দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, তারপর দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা। না, এতোগুলো দরজার কোনোটাই খোলা যাচ্ছে না। আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এখন উপায়!

সেই লুক্কায়িত ওত পেতে থাকা বিকট বিপদের ভয়টা একচ্ছত্র-ভাবে গ্রাস করে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু কি তার প্রকৃত রূপ, অনুভব করতে পারলেও, তা অজ্ঞাত এখনো।

চঞ্চল আলোচ্ছটায় স্বল্প উজ্জ্বল মুখোশ-পরিহিতা যুবতীকে এই খানিক আগে পর্যন্ত দেখাচ্ছিল কালো, ঘন কালো আকাশের গায়ে উজ্জ্বল একটি স্বভাবসুন্দর নির্বিরোধী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নক্ষত্রের মতো।

নক্ষত্রের সকল গুণ বিসর্জন দিয়েছে সে অকস্মাৎ। আস্তে আস্তে কুৎসিত আকার নিচ্ছে তার মুখাবয়ব। আমার আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে হিংস্র হয়ে উঠল সেই মুখাবয়ব। কর্কশ, প্রতিশোধ পরায়ণ কণ্ঠস্বর ঢুকল আমার কানে। চোখ দু'টো থেকে ওর বর্ষিত হচ্ছে গলিত অনল। চড়া গলায় বলে উঠল ও কারো উদ্দেশে: 'ওই যে লোকটা! ওই যে, তোমার পিছনে! সামলাও ওকে!'

যুবতীর নীচের সারির দাঁতের সাথে উপরের সারির ঘর্ষণে কটকট শব্দ হলো।

আলোর টুকরোটা প্রসারিত হচ্ছে। যেন কোনো ইলেক্‌ট্রিশিয়ান মঞ্চের নায়িকার উদ্দেশে ট্রিক-সুইচ হাতে নিয়ে নানাভাবে আলো নিক্ষেপ করছে।

আলোটা ঘোর অস্পষ্ট। রঙটা নীলচে সবুজ দেখাচ্ছে এই-মুহূর্তে, অনেকটা পানির নীচে যেমন দেখায় তেমনি। আর এই রহস্যময় ভৌতিক ভাঁজ ভাঁজ আলো-আঁধারিতে সেই বিকট বিপজ্জনক, ভীতিপ্রদ বিভীষিকাময় ভয়াল বস্তুটা, যার ভয় অনুভব করছিলাম, ধীরে ধীরে তার মাথা উঁচু করতে আরম্ভ করল। পানির নীচে মানুষ যেমন অস্বচ্ছন্দে নড়েচড়ে ঠিক তেমনি নড়তে চড়তে দেখলাম সেই অলৌকিক ভীষণকে। মন্থর গতি। নড়ছে তো নড়ছেই। পিছনে এলিয়ে পড়ছে মাথাটা। ওই যে, আবার উঠছে সোজা হয়ে। যমের মতো নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে প্রকাশিত হচ্ছে ওটা আমার সামনে।

যম পুরুষ, বুঝতে পারছি ওটাও পুরুষ।

প্রথমে জিনিসটাকে, মানে ওকে, দেখাচ্ছিল একরাশ গোবরের মতো, বা কঠিনভূত ধোঁয়ার মতো। ক্ষুব্ধ যুবতীর পায়ের কাছে অবস্থান করছিল ওটা। তাল পাকানো স্তূপ করা দড়ির অবস্থা

থেকে কুণ্ডলী ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা তুলে উঁচু হচ্ছিল ক্রমশঃ। মাথা খাড়া করছিল, লম্বা হচ্ছিল, বিশেষ আকৃতি লাভ করছিল সেই সাথে। তারপর ছোটো হয়ে যেতে লাগল। আমার সামনে সরে এলো। নিষ্প্রাণ, নির্জীব কোনো জড়পিণ্ড নয় ওটা আর এখন। যদিও সত্যিকার আকার এবং পরিচয় এখনও অজানা আমার, তবু যেন ধারণা হচ্ছিল, ও একটা বিশালকায় মানুষ। পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে সামনে। পিছনে গাঢ় নীল রঙয়ের পটভূমি।

আসছে ওটা। আমার দিকে এগিয়ে আসছে আরো। শিকারী বিড়ালের মতো ধুরন্ধর মন্থরগতিতে চলে আসছে সিধে। পালাতে চাইলাম এবার আমি। চাইলাম ঘুরে দাঁড়াতে। চাইলাম দৌড়ুতে। একমিনিট, আধমিনিট, পনের সেকেণ্ড—মাত্র পনের সেকেণ্ড আর সময় আমার হাতে। তারপরই ধরে ফেলবে ওটা আমাকে। এই কয়েকটা সেকেণ্ডের মধ্যেই বাঁচাতে হবে নিজেকে। কিন্তু আমি যেন জীবন্ত মানুষ নই এখন। বালি, সিমেণ্ট দিয়ে কেউ গেঁথে রেখেছে আমাকে।

কেন আমি ভয় পাচ্ছি জানি না, কেন আমি পালাতে চাচ্ছি জানি না, জানি না ওটা আমার কি ক্ষতি করবে, কোনো কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। শুধু রক্ত হিম করা কঠিন একটা ভয় আমার বুকে।

মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমশঃ ছোটো হয়ে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল আমার সাক্ষাৎ-ভীতি। কিছুটা আবছা, যেন থকথকে কাদা দিয়ে তৈরী কোনো বস্তু, কোনো মানুষ। দৃষ্টি এড়াল না, ছিংড়ি মাছের মতো ওর দু'পাশে সংযুক্ত দু'টো হাত। হাত দু'টো উঠে আসছে।

ভয়াবহভাবে অনুভব করছি দু'টো হাতের বজ্র-কঠিন পেষণ আমার সম্পূর্ণ কণ্ঠ জুড়ে। আমার গলার সম্মুখভাগের চেয়ে দু'পাশের অংশে অধিকতর শক্তিতে চাপ দিচ্ছে। গলা টিপে মেরে ফেলার বদলে ভেঙে ফেলে নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করার প্রয়াস পাচ্ছে। হাতের অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা নখযুক্ত আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতো ঠিক আমার চোখের নীচের নরম মাংসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। চোখ জোড়া উপড়ে ফেলবে যেন। চোয়ালের নীচেও প্রবেশ করছে দু'টো আঙুল। নেতিয়ে পড়তে পড়তে মাথা ঘুরিয়ে মুক্তি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি আমি। অক্টোপাশের মতো অমোঘ দু'টো হাত খুঁজে বেড়াচ্ছে চোখের নীচের নরম মাংসল জায়গাটুকু আবার। আঙুল দু'টো স্থানচ্যুত হয়ে গেছে একটু আগের শুভক্ষণে।

কৃপাহীন অমোঘ দু'টো হাতে নখ বসিয়ে দিয়েছি আমি। একটা হাত ছাড়িয়ে ফেললাম গলা থেকে। কিন্তু সেই হাতটাই আমার হাতের কব্জি ধরে নখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। জ্বালা করে উঠল কব্জির কাছে। চামড়া ছড়ে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল হঠাৎ আমার সর্বশরীর। কব্জির কাছের জ্বালাটা বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি লোমকূপে। বিপুল বেগে ঝাড়া দিলাম নিজেকে। নিষ্ঠুর দু'টো হাতই ছেড়ে দিল আমার গলা এবং হাত। স্বস্থানে ফিরে গেল সে মুহূর্তের জন্যে। আবার নড়ে উঠছে। বিশালকায় থামের মতো শরীরে নীচে থেকে ধাক্কা মারলাম অন্ধের মতো। তারপর দুর্বল হয়ে পড়লাম আবার। নিঃশেষে সব শক্তি যেন চুষে নিয়েছে কেউ আমার শরীর থেকে। কোথা থেকে যেন এতটুকু শব্দ এসে ঢুকল আমার কানে। হাত দু'টো তুললাম। জোরে ধাক্কা মারার শক্তি নেই আর। আস্তে আস্তে ঠেলা দিচ্ছি। হঠাৎ

একটা বোতাম বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মুঠোয় চলে এলো। প্রাণপণে নাছোড়বান্দার মতো বোতামটাকে মুঠো করে ধরে আছি আমি। এটাই যেন শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে আমাকে! মুমূর্ষু হাল আমার। চেতনা আছে, কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ছি। চেষ্টা করছি বোতামটাকে আরো শক্তভাবে মুঠোর মধ্যে চেপে রাখতে।

সহজতম মন্থর ভঙ্গিতে কিভাবে যেন আমাকে মেরে ফেলছে দুশমনটা, টের পেলাম। গলা বন্ধ হয়ে আসছে। আমার শরীর খাড়া হয়ে দুলছে। তারপর আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম। একটু একটু করে নড়তে নড়তে উঠে বসলাম শেষ পর্যন্ত। তারপরই শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর। আমার কানে তার কথার প্রতিটি শব্দ গম্ভীর দৈব আদেশের মতো শোনাল। সাদাটে ঈষৎ উজ্জ্বল মুখোশ-পরিহিতা যুবতীর উদ্দেশে সে বলে উঠলঃ কুড়ুলটা দাও আমার হাতে, ওই যে চকচকে ধারালো নতুন কুড়ুলটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে—দাও আমাকে, তা না হলে এই জুলুম চলবে সারারাত!

বোবা বনে গিয়ে দু'টো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে অসহায় পশুর মতো নাড়তে নাড়তে আপত্তি প্রকাশ করছি। প্রায় সাথে সাথেই আমার কাঁপা হাতে কি যেন ভারী একটা বস্তু ঠেকল। কে যেন ধরিয়ে দিল সেটা আমার হাতে। অনুভব করলাম, বস্তুটার লম্বাপানা শক্ত হাতল। মাথার ভিতরে একটা ধারণা বিদ্যুতের মতো দ্রুত খেলে গেল—মুখোশ-পরিহিতা যুবতীটি বিশালকায় দৈত্য-বিশেষ শত্রুটির পরিবর্তে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ধারালো নতুন কুড়ুলটা। সর্বশক্তি দিয়ে সেটার হাতল কষে ধরে ফেলেছি আমি। এবার তুললাম সেটাকে উপর পানে। তারপরই

আমার শত্রুর উপর সজোরে ঘা মারলাম সেটা দিয়ে। তার শরীরে অস্ত্রটা গেঁথে যাবার ফলাফল পলকের ভিতরে যেন আমার সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে অবশ হয়ে গেল সর্বশরীর। কিন্তু গেঁথেছে অস্ত্রটা শত্রুর শরীরে, আমার শরীরে নয়, আমি শুধু চমকে উঠেছি। গেঁথেছিল অস্ত্রটা খুব সহজেই, বের করার সময় কঠিন মনে হলো।

আমার ভীতি, আমার প্রাণের দুশমন চিত হয়ে পড়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে সরে গেলাম এবার। বহু দেরী হয়ে গেলেও এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি আমি তার মুখটা। যেন মৃদু, অথচ পরিষ্কার আলো খেলা করছে তার মুখের উপর। মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্কার করলাম: দৈত্য নয়, বিশালকায় কোনো জানোয়ার নয়, এমনকি কাদার এবড়ো-খেবড়ো কোনো মূর্তিও নয় বা কঠিন-ভূত ধোঁয়াও নয়—সে আমারই মতো একজন মানুষ। নিরীহ, অসহায়, শক্তিহীন। তার সারা মুখ করুণ এবং সেই সাথে ঘৃণামিশ্রিত-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে যেন সে বলছে, 'কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে আমার!'—সহ্য করতে পারলাম না, ধাতুর তৈরী অস্ত্রটা সিধে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। পর মুহূর্তে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম আমি।

মুখোশ-পরিহিতা যুবতী এখনো রয়েছে কালো পটভূমির উপর। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ গলায় আতঙ্কিত চীৎকার করে উঠে সে তুমুল ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হবার শব্দ আমার কানে ঢুকল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালাম আমি। কোন্ দরজা দিয়ে যুবতীটি ঘর থেকে বের হয়ে গেল? দরজাটা চিনতে পারলে আমিও পারব ঘরের বাইরে

বের হতে। কিন্তু, সব ব্যাপারের মতোই এবারও দেরী হয়ে গেল আমার। আমি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই সে চলে গেছে। সবগুলো দরজাই দেখছি বন্ধ। আমি শঙ্কিত বুকে দরজাগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা দরজার গায়ে ধাক্কা মারলাম। কিন্তু আসল দরজা কোনটাই নয়। বাইরে বের হবার পথ আমাকে কোনো দরজাই দিচ্ছে না। তার মানে, এই ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারব না আমি। ফাঁদে পড়েছি, বন্ধ ঘরে আটকে গেছি, আর ঘরের ভিতর শোয়ানো রয়েছে ওই যে ওটা—লাশটা! যেটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অবিরাম। যখন ওটা আমাকে আক্রমণ করেছিল তার চেয়েও ভীষণ আতঙ্কে জড়সড় করে দিচ্ছে এখন।

প্রায়শ্চিত্ত করার আর কোনও উপায় আমি রাখি নি, যা করবার করে ফেলেছি, এই মুহূর্তে ভুল সংশোধন করা যাচ্ছে না। কোন মড়াকেই বাঁচিয়ে তোলা যায় না, জানি। ওটাকে বাঁচিয়ে তোলার চেয়ে ওটার একটা ব্যবস্থা করার ভাবনাই এখন আমার মাথা-ব্যথার কারণ।

লাশটাকে লুকিয়ে ফেলা একান্তভাবে দরকার। ঢাকা দিয়ে আড়াল করতে হবে যেভাবেই হোক।

ধাক্কা মারলাম আমি অনেকগুলো দরজার একটার গায়ে। দু'টো পাল্লাই খুলে গেল। আয়না লাগানো কবাটের পিছনে বাইরে বের হবার পথ দেখা যাচ্ছে না, ঘরের পূর্বোক্ত সেই নীলকান্ত মণির মতো বিচ্ছুরিত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ছোটো গহ্বর মতো একটা ফাঁকা জায়গা। হঠাৎ সন্দেহ করলাম, দরজার ভিতরে এই ফাঁকা স্থানটা আগের মুহূর্তটিতেও ছিল না, যেন এখুনি, যেন আমার প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই তৈরী হয়েছে এটা। মেঝে থেকে তুলে ফেললাম

আমি আমার সেই ভীতির মূর্তিমান কারণটাকে। অতি সহজেই তুলে ফেললাম আমি তাকে। খুব হালকাই বোধ হচ্ছে। যেন হালকা কার্পেট বা মাদুরবিশেষ। ফাঁকা গহ্বর মতো জায়গায় ঢুকিয়ে দিলাম সেটা আমি। ভিতরে আর বিশেষ জায়গা রইল না।

এবার আয়না লাগানো পাল্লা দু'টো দিলাম বন্ধ করে। কবাটের এখানে-সেখানে হাতের চাপ দিয়ে ভালভাবে ঠেলে দেবার কাজে লেগে গেলাম আমি। ফ্রেমের উপরে-নীচে হাতের থাবা চেপে চেপে, আয়নার গায়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাজটা সুচারুভাবে সমাপ্ত করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, ভালভাবে বন্ধ হয় নি পাল্লা দু'টো, যে কোনো মুহূর্তে খুলে যেতে পারে। ভয়ে কেঁপে উঠছে বুকের ভিতরটা। আরো ভাল কোনো ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে দরজাটা বন্ধ করে রাখা যাবে না, খুলে যাবেই।

নীচের দিকে তাকালাম। দরজার নবের নীচেই একটা চাবি মাথা বের করে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। চাবির যে দিকটা তালায় ঢোকানো হয় না সে অংশটাকেই মাথা বলছি আমি। এই চাবিটার মাথার দিকটা বড় অদ্ভুত। পাশাপাশি তিনটে গোল রিং দেখতে পাচ্ছি মাথার দিকটায়। চকচক করছে রিং তিনটে, ঠিক যেন এখুনি কেউ পালিশ করে রেখে গেছে। কোনো হলুদাভ ধাতু দিয়ে তৈরী চাবিটা। এই ধরনের চাবি জীবনে আর কখনো দেখেছি বলে স্মরণে আসছে না। এ ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরী হয় এবং খুব কমই ব্যবহার করা হয়। অবশ্য আদৌ এ রকম চাবি ব্যবহার করা হয় কিনা তা আমার সত্যি সত্যি জানা নেই।

চাবিটা আঙুল দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে নিলাম আরো খানিকটা। তারপর ধীরে ধীরে টানতে শুরু করলাম। কি ভীষণ লম্বা চাবিটা,

কী-হোল থেকে বের হচ্ছে তো হচ্ছেই। অবশেষে অবশ্য বেরিয়ে এল অস্বাভাবিক লম্বা চাবিটা। নীচের দিকে দু'টো দাঁত দেখতে পাচ্ছি, দাঁতের অগ্রভাগগুলো তীর চিহ্নের মতো দেখতে।

চাবিটা দেখলাম মনোযোগ দিয়ে, তারপর পকেটে ভরে রাখলাম, এবং পরক্ষণে দেখতে পেলাম দরজার হাতলটা ধীরে ধীরে, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ঘুরছে। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলছে। নিশ্চিতভাবে খুলছেই একটানা। খুলছে, খুলছে···খুলে যাচ্ছে !

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল আমার।

দুই

ঘুম ভাঙতে দেখি বিছানা থেকে বালিশটা ফেলে দিয়েছি মেঝেতে। আমার মাথাও ঝুলে পড়েছে খাট থেকে। শরীরটাও আধাআধি ঝুলছে। সারামুখে ঘাম, ভিজে গেছি। স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করে আপন মনেই বললাম: যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত তাহলে ভীষণ ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নই ছিল।

মাথাটা ঝাড়া দিলাম দুঃস্বপ্নের পরের অবশিষ্ট আচ্ছন্নতা বোধটুকু ঝেড়ে পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে। ঘড়ি দেখলাম। বিছানা ছাড়ার সময় হয়েছে অবশ্যই। সময় না হলেও কে আর অমন দুঃস্বপ্ন দেখার পর আবার ঘুমোবার প্রয়াস পেত ?

পা দু'টো নামিয়ে দিয়ে বসলাম বিছানার কিনারায়। মোজা জোড়া তুলে নিয়ে সোজা করলাম উল্টে দিয়ে।

সত্যি, স্বপ্ন দেখা বড় অদ্ভুত আর মজার ব্যাপার। কোথা থেকে আসে ওগুলো? যায়ই বা কোথায় মিলিয়ে?

বাথ-রুমে গিয়ে ঠাণ্ডাজলে মুখ ধোয়ার সময় ঘড়িটা খুলে রাখলাম। মুখ ধোয়ার পর সবটুকু ক্লান্তিবোধ দূর হয়ে গেল। স্বাভাবিক, সহজ, পরিচিত এবং নিশ্চিত পরিবেশ অনুভব করছি। চিরুণীর অভ্যস্ত কামড়, পানির সুপরিচিত স্বাদ, সিগারেটের চেনা আকৃতি—সবই ঠিক আছে। সব স্বাভাবিক ঠেকছে। হাত-ঘড়ির বেল্ট লাগাচ্ছি। বেল্টের দুই প্রান্ত ঝুলছে কব্জির দু'দিকে।

ঘড়ির বেল্টটার একটা অংশ কাটা দেখছি।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় জেগেই মিলিয়ে গেল বুক থেকে।

হাতের আস্তিন কব্জি পর্যন্ত নামিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিলাম। কাটা বেল্টের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সে কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু কেন, কিভাবে ঘড়ির বেল্টটা ওভাবে কাটল? এর কোনো সঠিক উত্তর আমার জানা নেই, স্বীকার করছি। কিন্তু এর আবার উত্তরই বা কি? না হয় বেল্টটা কেটেছে, কোনো না কোনোভাবে কেটে গেছে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

"ভাবো বাস্তব স্বপ্নটার ব্যাপারখানা!"—আমি মনে মনে বললাম, "আমার ধারণা, হাত-ঘড়ির বেল্টটা আমার অপর হাতের নখ দিয়ে আমি নিজেই কেটে ফেলেছি স্বপ্নের ঘোরে।"

কব্জির হাড়ের উপরের চামড়ায় আঁচড়ের দাগও দেখতে পাচ্ছি। লাল হয়ে গেছে দাগগুলো। এগুলোও আমি স্বপ্নের ঘোরে করেছি, অবিশ্বাস করার উপায় নেই। অন্য কিছুতেই হতে পারে না।

কাজ সারতে লাগলাম একটা একটা করে। দৈনন্দিন ঝক্কি-ঝামেলা নেই আমার। একা থাকি। খাওয়া-দাওয়া করি বাইরে। বাবা-মা

থাকেন ঢাকায়। চিটাগাংয়ে আছি বেশ কিছুদিন থেকেই। পাঁচটা পাণ্ডুলিপি তৈরী করার প্ল্যান নিয়ে এসেছি। তারমধ্যে তিনটেই বাকী এখনো। চিন্তা নেই, প্রকাশক টাকা নিয়মিতই পাঠাচ্ছেন। সময় নিয়ে লিখব।

আপনজন বলতে আমার বোন রাহেলা থাকে এখানে, তাও এ বাড়ীতে নয়, স্বামীর সাথে শহরের মধ্যভাগে একটা দোতালা ফ্লাট নিয়ে। হাম্বান বয়সে আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, রাহেলার সাথে বিয়ে হবার আগে থেকেই জানাশোনা আমাদের। বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক। বোনটিও অবশ্য আমার চেয়ে বড়। ওদের দু'জনার বয়স প্রায় সমান সমান।

চিটাগাংয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে ওরা। পুলিশ বিভাগে চাকরি করে হাসান। বড় অফিসার। কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল। ব্যক্তিগত জীবনে তো বটেই, চাকরি-জীবনেও। ওদের ছেলেমেয়ে হয় নি, ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমাকে থাকতে বলেছিল ওদের সাথে। রাজী হই নি। প্রায় অকারণেই একা থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছি এখানে। দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই করি অবশ্য সুযোগ মতো।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আজ আর লাল টাই নয়, নীল টাই নেব। একদিন পর পর বদলাই। শার্টের কলার উল্টে দিয়ে আবার ফেলে দিলাম যথাযথ……।

একি, আমার গলায় ক্ষতচিহ্ন·· কোথা থেকে এলো! কখন হলো···?

আমার হাত স্থির হয়ে গেল সেভাবেই। গলার কাছে ধরে আছি কলারের দুই প্রান্ত। আমার মাথার একটা অংশ প্রস্তুত হয়ে উঠেছে ভয়ের আঘাত পাবার আশঙ্কায়। আয়নার দিকে বোবা দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছি। একি কাণ্ড···একি অবাক কাণ্ড! কি হতে পারে এই ক্ষতচিহ্নগুলোর মানে? গতরাতে শুতে যাবার সময় এই দাগগুলো দেখি নি। হলপ ক'রে বলতে পারি, গতরাতে ঘুমোবার আগে এই ক্ষতচিহ্নগুলো ছিল না আমার গলায়। দাগগুলোর রঙ খয়েরী হয়ে গেছে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শক্তিশালী কোনো মানুষের হাত দিয়েই এই রকম গভীর দাগের সৃষ্টি সম্ভব। নিষ্ঠুর আঙুলের আঁচড়, চাপ, পেষণ।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি আমি। চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতে চাইছে মন। কি ব্যাখ্যা দেব এগুলোর? একমাত্র ব্যাখ্যাটি শোনালাম নিজেকেই: স্বপ্নের ঘোরে আমি স্বয়ং স্বহস্তে নিজের গলা টিপে ধরেছিলাম।

তবু সরে আসতে পারছি না আয়নার সামনে থেকে, তবু চোখ ফেরাতে পারছি না গলার ক্ষতচিহ্নগুলোর দিক থেকে, তবু দূর হচ্ছে না বুকের অস্বস্তি। গলায় আঙুলের যে লম্বা লম্বা দাগগুলো দেখছি সেগুলো মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশঃ বাঁ পাশের গলার দাগগুলো ডান হাতের আঙুলের দাগ। আর ডান দিকেরগুলো বাঁ হাতের। মানুষ কি ঘুমুলে অমন ভঙ্গিতে অবস্থান করে? আমি কি ওই ভাবে শুয়েই নিজের গলা টিপে ধরেছিলাম? হয়ত তাই···।

কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতে হচ্ছে আমাকে ব্যাপারটা। গলার দাগগুলো একটা হাতের নয়, নিঃসন্দেহে। বাঁ'দিকে যে ক'টা দাগ, ডানদিকেও সেই ক'টা। এবং প্রতিটি হাতের বুড়ো আঙুল বিপরীত দিকের চামড়া ছেঁচে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলছে ক্ষতগুলোর ব্যথা। বেশ ব্যথা বোধ

হচ্ছে। গলাটা ঘোরালাম। চমকে উঠলাম এবার। ব্যথায় প্রায় ককিয়ে উঠলাম আমি। এতোক্ষণ গলা নাড়ি নি বলে বুঝতে পারি নি টাটানিটা। প্রশ্ন জাগছে—যেভাবেই হোক না কেন ক্ষতগুলো, আমার ঘুম ভাঙলো না কেন?

কিন্তু এতোসব ভাবলে চলবে না। সন্দেহবাতিক মন আমার। এবং স্বপ্নটাও ছিল সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর। যা দেখছি তাতেই ভয় পাচ্ছি। কাজে মন লাগাবার প্রয়াস পেলাম। বাধ্য করলাম নিজেকে। শার্টের বোতাম আঁটলাম, টাই পরে নিয়েছি। ক্ষতচিহ্নগুলো ঢাকা পড়লো, কিন্তু সবটুকু নয়। কোট পরলাম। ঘড়িতে ছ'টা দশ। দেরী হয়ে গেল বড্ড। ছবি আঁকতে যাবার প্রোগ্রাম আজ। আমি আর আমার দুই বন্ধু দূরবর্তী পাহাড়ের দিকে যাব। ফিরে আসব সন্ধ্যার দিকে।

আমি তৈরী। এবার ঘরে তালা মেরে বের হয়ে পড়লেই হয়। মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে। টাকা-পয়সা নিয়েছি তো?

বুক-পকেটে হাত ঢোকালাম। নিয়েছি। কিন্তু খুচরো টাকা নেই দেখছি একটাও, সব দশ টাকার নোট। খুচরো পয়সা আছে তো? প্যান্টের পকেটে হাত ভরে দিলাম।

কয়েকটা সিকি-আধুলি বের করে আনলাম পকেটের ভিতর থেকে। খুচরো পয়সাগুলোর মাঝখানে একটা বোতাম দেখা যাচ্ছে। চমকে উঠলাম আমি। কেঁপে উঠল হাতটা। সিকি-আধুলিগুলো পড়ে গেল হাতের মুঠো থেকে। বোতামটাও।

মেঝেয় পড়ে থাকা বোতামটা দেখছি বিস্ফারিত নেত্রে। সর্বশরীরে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বোতামটা তুললাম। স্পর্শ করলাম। মুঠোর মধ্যে ভরে শক্ত

করে ধরে রইলাম। সেই অনুভূতি। সেই স্বপ্নের মধ্যকার অনুভূতি। অনুভব করছি, স্বপ্নের মধ্যে বোতামটাকে মুঠো করে ধরার সময় যেরকম স্পর্শবোধ করেছিলাম এখনও ঠিক তেমনি করছি।

তার মানে, কোনো সন্দেহ নেই আর, এটা সেই বোতামটাই। সেই একই বোতাম। স্বপ্নে যে বোতামটা দেখেছিলাম এটা সেটাই।

অস্বাভাবিক এর আকার, অদ্ভুদ এর রঙ। এ বোতাম আমার নয়। তবু আমার সব পোশাক পরীক্ষা করলাম। কোনো বোতামের সাথেই মিল খেল না বোতামটা। এমন কি আমার কোনো পোশাকের বোতাম হারিয়েও যায় নি। না, এটা আমার বোতামই নয়।

নিরাশায়, ভয়ে, আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। ভয় পাচ্ছি, ভীষণ ভয় পাচ্ছি। জীবনে এমন ভয় আর কখনো পাই নি।

স্বাভাবিক দৈনন্দিন নিয়মমাফিক সময় কাটানো এরপর আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এখন আর নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলতে পারছি না—"স্বপ্নের ঘোরে কব্জি আর গলার ক্ষতচিহ্নগুলোর মতো বোতামটাও সংগ্রহ করেছি স্বয়ং আমি।" এটা অন্য কোথাও থেকে আমদানি হয়েছে। সুতো গলাবার চারটে ছিদ্র এর মাঝখানে। কালো একটা সুতোও ঝুলছে বোতামটার গায়ের সাথে। বোতামটা সলিড ফাঁপা নয়।

কিন্তু মাঝ সমুদ্রে পড়ে গেছি আমি। পড় হাবুডুবু খাচ্ছি। না পাচ্ছি কূলের নিশানা, না মেনে নিতে পারছি পরাজয়। যদি মেনে নিই, বোতামটা স্বপ্নের মধ্য থেকে এসেছে, এসেছে বাস্তবে, তাহলে পরাজয় বরণ করতে হয় আমাকে। কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এমন অসম্ভব কল্পনাকে। মেনে নিলেই তো হচ্ছে না, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা পেতে হবে তো? কিন্তু এ ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা আছে আমার? বর্তমান যুগের মানুষ হয়ে স্রেফ ভৌতিক ব্যাপারটা

স্বীকার করে নেব কিভাবে, নেবই বা কেন? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ও দেখছি না। প্রবোধ অবশ্য দেয়া যায় নিজেকে একভাবে—"বোতামটা আমি হয়ত কুড়িয়ে এনেছিলাম কোনো সময় রাস্তা থেকে। এবং এই মুহূর্তে সে কথাটা মনে পড়ছে না আমার।"—কিন্তু তা তো নয়। তা যে নয় সে কথা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? রাস্তা থেকে কখনও কোনো বোতাম আমি কুড়িয়ে আনি নি।—"কিম্বা আমার পোশাক তৈরী করেছে যে দর্জি সে হয়ত অন্য কোনো লোকের পোশাকের বোতাম অসাবধানতা বশতঃ আমার পোশাকের পকেটে রেখে দিয়েছিল।"—আসলে হয়ত ওই রকম কিছুই হয়েছে, আর—"আমার নার্ভগুলো কতটুকু উত্তেজনা সইতে পারে আজ তার পরীক্ষা হবার পালা।" কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না একথায়। তা না দিক, হয়ত ভুল করছে আমার মন-ই।

ঘরে নয়, ঘরে থাকা উচিত নয় আর। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মাথাধরার কোনো ট্যাবলেট খেয়ে নেব এক কাপ চায়ের সাথে?

কোটটা পরে নিলাম। দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ভাবলাম, চারদিক কেমন নিস্তব্ধ। চারদিকের নিস্তব্ধতা আমাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। জোরে জোরে পা ফেলে এগোলাম দরজার দিকে। শব্দ উঠল জুতোর। দরজার পাল্লা দু'টোর গায়ে সজোরে ধাক্কা মারলাম। সশব্দে খুলে গেল পাল্লা দু'টো। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে বের হবার সময় সর্বশেষ কাজটি হলো পকেটে ঘরের চাবি আছে কি না পরীক্ষা করে দেখা। দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। কোটের পকেটে হাত ভরে দিলাম চাবি আছে কি না দেখার জন্যে। চাবি ঘরের ভিতরে থেকে গেলে মুশকিলে পড়ব পরে।

কোটের পকেট থেকে আমার চাবির গোছাটা বের করে আনলাম। মুঠো খুলে দেখলাম।

আমার নিজস্ব চাবির গোছার সাথে সেই, সেই অদ্ভুত চাবিটা পকেটের ভিতর থেকে উঠে এসেছে মুঠোর মধ্যে। চাবিটার দুই প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝখানটায় আমার অন্যান্য চাবি পড়ে রয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাঁ হয়ে গেল আমার মুখ, যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণায় হাঁপাচ্ছি আমি। ঠোঁট দু'টো ফাঁক হয়েই রয়ে গেল, বন্ধ হচ্ছে না আর।

এটা সেই অত্যাশ্চর্য চাবিটাই। এটার মাথার দিকটা বড় অদ্ভুত। পাশাপাশি তিনটে গোল রিং দেখতে পাচ্ছি মাথার দিকে। চকচক করছে রিং তিনটে, ঠিক যেন এখুনি কেউ পালিশ করে রেখে গেছে। কোন হলুদাভ ধাতু দিয়ে তৈরী চাবিটা। এই ধরনের চাবি জীবনে আর কখনো বা আর কোথাও দেখেছি বলে স্মরণে আসছে না। গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি বটে। স্বপ্ন থেকে আমার বাস্তব জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই ব্যাখ্যাহীন বিষয়টা। এ ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরী হয় এবং খুব কম ব্যবহার করা হয়।

বাইরে বের হবার জন্যে তৈরী হয়েছি বটে, কিন্তু এরপর আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। দরজা খুলে ঘরের ভিতরে ফিরে এলাম আবার। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম মেঝের উপর। ভয় লাগছে আমার। আমি যেন ভয়ানক ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো টের পেয়ে যাচ্ছি। মানুষ পাগল হবার আগে নিজেই তার লক্ষণগুলো বুঝতে পারে কিনা জানা নেই আমার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। এ ঠিক ব্যাখ্যা করে লেখা যাবে না। পরিষ্কার টের পাচ্ছি, পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। ভয় পাচ্ছি সেই জন্যেই। চমকে উঠছি নিজের পদশব্দেই। বাতাসে ক্যালেণ্ডারের পাতা

নড়ছে, শিউরে উঠছে আমার সর্বশরীর। নিঃশ্বাস পতনের শব্দে, নিজেরই নিঃশ্বাস পতনের শব্দে চেঁচিয়ে ওঠবার উপক্রম করছি।

আস্তে আস্তে, দিশেহারার মতো, টলতে টলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বিছানার ধারে ধপাস করে নিজের অজান্তেই বসে পড়লাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কোথায় বসে পড়েছি, যেন বুঝতে পারি নি আগে। পর মুহূর্তেই সবেগে উঠে দাঁড়ালাম, ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফারিত চোখ মেলে আয়নার সামনে, আয়নার গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। চিনতে পারছি নিজেকে। কোনো সন্দেহ নেই, কোনো ভুল নেই—আয়নার গায়ে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সে আর কেউ নয়, জল-জ্যান্ত আমি। অর্থাৎ বেঁচে আছি আমি এবং চিনতেও পারছি নিজেকে অর্থাৎ পাগল হয়ে যাই নি তখনো। তবু চোখের নীচের একটা পাতা আঙুল দিয়ে নামিয়ে চোখের মণিটা দেখলাম একাগ্রভাবে। জানি না এমন কেন করছি, জানি না এমন কাণ্ড করে কি বুঝতে চাইছি। অবশ্য কিছু অনুভব করছি না।

তারপর চিমটি কাটলাম নিজেকে। ব্যথা লাগছে। হাতের আঙুল মটকালাম। পরিষ্কার পর্বাস্ফোটের শব্দ শুনছি—ফট, ফট। ছুটে গেলাম জানালায় পাশে। যেন সন্দেহ হচ্ছিল, বাইরের পৃথিবী বলে কিছু আছে কিনা

পৃথিবী আছে। আছে আগের মতোই। রাস্তার পাশের বাড়ীগুলো ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেমন গতরাতে ঘুমুতে যাবার আগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ঠিক বিপরীত দিকের বাড়ীর বৃদ্ধা ছাদের রেলিংয়ে লেপ-তোষক শুকাতে দিচ্ছে। খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছে সাইকেলে চেপে। একজন আইসক্রীমওয়ালা বাচ্চা ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম বিক্রি করছে। বাচ্চা একটা ছেলে বই-

খাতা বগলে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। একটা ইটের টুকরো জুতোর ডগা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে যাবার পথে।

পার্থিব জীবনযাত্রায় কোথাও কোনো ছেদ পড়ে নি। কোথাও কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই। অস্বাভাবিকতা শুধু আমাতে।

সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রোগ্রাম অনুযায়ী বন্ধুদের সাথে ছবি আঁকতেই যাব। হয়ত ভুলে থাকতে পারব ভয়গুলো। নরক থেকে বেরিয়ে পড়লাম, অর্থাৎ ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু কোথাও বসে খেতে ইচ্ছে করছে না। ক্ষিদে হয়ত পায় নি, খাবার ইচ্ছে জাগছে না, দৈনন্দিন অভ্যাসটার কথা মনে পড়ছে শুধু।

রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে স্মরণ হলো, বন্ধুরা সবাই চলে গেছে অনেক আগেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী। আমার জন্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল নিশ্চয়, পৌঁছুইনি দেখে রওনা হয়ে গেছে ওরা। সাড়ে ন'টা বাজে। সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে, বন্ধুদের সান্নিধ্যে কোনো ফল পাব না, সম্ভবও নয় পাওয়া।

তিন

সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়ালাম। সূর্যের আলো ছাড়া হাঁটলাম না। যে রাস্তায় উত্তপ্ত সূর্যালোক দেখলাম না, সে রাস্তায় পা বাড়ালাম না। শীতের দিন, রোদে তেজ নেই তেমন। গরম হলো না

আমার শরীর, শীত শীত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না কোনো-মতেই। ছায়া এড়িয়ে এড়িয়ে কতক্ষণ আর থাকা সম্ভব, একসময় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে শুরু করল। যতটুকু তেজ ছিল রোদের, তাও ম্রিয়মান হয়ে আসছে। ছায়াগুলো বিস্তৃত হচ্ছে। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর-বার। সেই সাথে ভীতিবোধটা জাগছে। ঠাণ্ডার সাথে ভয়ের একটা যোগাযোগ আছে, আজ বুঝলাম।

রাত ঘনিয়ে আসছে দুঃস্বপ্নের সময় সমাগতপ্রায়। রাত, আমার শত্রু, ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে সেই বিভীষিকাময় সময়।

কয়েক ঘণ্টা ধরেই ভাবছি, রাহেলাদের বাড়ী যাব। দেরী করারও কারণ ছিল এতোক্ষণ। রাহেলার সাথে এসব ব্যাপারে আলাপ করার মানে হয় না। আমার বোন বটে, কিন্তু সে মেয়েমানুষ। মেয়েদেরকে সব কথা বলা উচিত বলে মনে করতে পারি না কেন জানি।

অনেকক্ষণ সময় রাস্তায় রাস্তায় কাটল আরো। তারপর ওদের বাড়ীতে এলাম। বারান্দা থেকেই দেখতে পেলাম, খাবার টেবিল থেকে এখনো ওঠে নি ওরা। ভূতের মতো দাঁড়িয়েই রইলাম বারান্দায়। মিনিট পাঁচেক পর জানালা দিয়ে দেখলাম রাহেলা টেবিল ছেড়ে উঠল। বাসন-কোসন উঠিয়ে নিয়ে গেল চাকর ছেলেটা। রাহেলাও গেল ভিতরের ঘরে। হাসান একটা আরাম কেদারায় উঠে গিয়ে বসল। ঘরের ভিতরে এখন ও একা। এবার আমি বেল টিপলাম

কিন্তু দরজা খুলে দিল রাহেলাই। আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বলে উঠলঃ কিরে, ক'দিন ধরে তোর যে দেখাই নেই! কোথায় থাকিস বল দেখি, একবার আসতে ইচ্ছে করে না?

কি উত্তর দিলাম ভাল করে নিজেই বুঝলাম না। আমার মনের ভিতরকার বিভীষিকা লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি বুক-সেলফ্‌টার কাছে

গিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলাম। মনে মনে চাইছি, রাহেলা বের হয়ে যাক ঘর থেকে। কিন্তু রাহেলা আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলেছে তো চলেছেই। ওর কথা শুনছি না আমি, কি বলছে, জানি না। নিশ্চয়ই পর পর কয়েকদিন আসি নি বলে রাগ হয়েছে; অভিযোগ ওর সেইজন্যেই।

আরো একটা বই টেনে নিয়ে মাথা হেঁট করে ধীর পায়ে এসে বসলাম সোফায়। রাহেলা আরো কয়েক মিনিট কথা বলে চলে গেল ভিতরের ঘরে। ও চলে যেতেই হাত থেকে বইগুলো পাশে রেখে দিলাম। হাসানের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে। ফিসফিস করে বললাম ওকে: শার্টটা বদলে নাও, হাসান। তোমার সাথে জরুরী একটা আলাপ আছে। তোমাকে একা দরকার, একটা জরুরী কথা আছে।

আমার সৌভাগ্য, হাসান পাল্টা কোনো প্রশ্ন করল না, যদিও অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ও আমার দিকে। কি ভাবল, জানি না। তবে আমার কণ্ঠস্বরে বুঝতে ওর বাকী নেই যে, আমি সত্যি কোনো জরুরী ব্যাপারে কথা বলব। আর জরুরী ব্যাপারগুলো মাত্রই বিপজ্জনক হয়, তা ওর অজানা নয়।

আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়াল ও। আমার সাথে বারান্দায় এসে রাহেলার উদ্দেশে হাঁক ছেড়ে বলল: আমি আর রহমান একটু বাইরে যাচ্ছি, এসে পড়ব খানিকক্ষণের ভেতরেই

রেহানা রান্নাঘর থেকেই বলে উঠলো: চা খেতে যাচ্ছ বুঝি? আমার কথা তুমি তো শুনবে না, যাকগে, খাবে যখন তখন বাইরে কেন, আমিই না হয় করে দিচ্ছি। রহমানের জন্যে তো করবই।

হাসান আমার দিকে তাকাল। আমি মাথা নেড়ে আপত্তি

জানালাম। হাসান রেহানার উদ্দেশে বলল: না, বাইরে চা খেতে যাচ্ছি না। তুমি চা পান কর, আসছি আমরা।

বাড়ী থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। ফুটপাথ ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। হাসান কোনো কথা জিজ্ঞেস করছে না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। গম্ভীর প্রকৃতির, স্বল্পবাক মানুষ ও। পুলিশ বিভাগে চাকরি করে তার উপর। কথা কম বলাই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। অবশ্য কিংবদন্তি অনুযায়ী কড়া মেজাজের দাস নয় ও। মৃদুমন্দ সমীরণের মতো প্রকৃতি ওর। আমার প্রতি ওর কখনো কোনো অভিযোগ ছিল না। নেইও। আমাকে ভালবাসে ও, সন্দেহ করি না আমিও ওকে। পুলিশ বিভাগে চাকরি করে বলেই সব কথা বলব বলে সিদ্ধান্ত নিই। এমনিতেও বলতাম ওকে, ওর প্রতি আমার আস্থা আছে। তাছাড়া পুলিশ বিভাগের কর্মচারী বলেও আমার বিপদের কথা ওকে জানানো দরকার।

কি ব্যাপার হে? তোমাকে এমন নির্জীব মনে হচ্ছে কেন?

অবশেষে জানতে চাইল হাসান।

হাসান, গতরাতে স্বপ্নে আমি একজন মানুষকে খুন ক.রছি। লোকটাকে আমি চিনি না, জায়গাটাও আমার অজানা। লোকটার নখ আমার হাতের কব্জির উপর দাগ বসিয়ে দিয়েছে। গলার দু'দিকে তার আঙুলের চাপে দাগ বসে গেছে, রক্ত জমে গেছে। তার পোশাকের কোনো জায়গা থেকে একটা আশ্চর্য রকমের বোতাম ধস্তাধস্তির সময় আমার মুঠোয় চলে আসে। তারপর, যখন আমি খুন করে ফেলেছি অর্থাৎ সে যখন নিহত হলো, তাকে, তাকে মানে তার লাশটাকে একটা দেয়াল আলমারির ভিতরে ঢুকিয়ে রাখলাম। তালা বন্ধ করে চাবিটা আমার পকেটে রেখেছিলাম। আর, তারপর, যখন ঘুম ভেঙে গেল

আমার···আচ্ছা, এই যে দেখো, নিজের চোখে সব দেখ তুমি হাসান।

আমরা একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে, ফুট-পাতের উপর দাঁড়িয়ে-ছিলাম। হাসানের মুখোমুখি হলাম আমি। শার্টের আস্তিন সরিয়ে কব্জিটা দেখালাম।

দেখছ, হাসান ?

হাসান মাথা নেড়ে জানাল, সে ক্ষতচিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছে। শার্টের কলার সরিয়ে গলার দাগগুলো দেখালাম এবার।

দেখতে পাচ্ছ ? রক্ত জমে গেছে, কালচে হয়ে গেছে দাগগুলো।

আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল হাসান।

আর, যে বোতামটার কথা বললাম তোমাকে, সেটা স্বপ্নে যেরকম দেখেছি, যেমন আকার, যেমন আকৃতি, যেমন রঙ—ঠিক তেমনি আকারে, তেমনি আকৃতিতে, তেমনি রঙে, ঘুম ভাঙার পর পকেটের ভিতর থেকে আবিষ্কার করেছি একটা বোতাম। পকেটে খুচরো পয়সার সাথে মিশে ছিল ওটা। তুমি যদি আমার সাথে যেতে পার দেখাতে পারি সেটা। ঘরে রেখে এসেছি বোতামটাকে। কিন্তু অদ্ভুত চাবিটা সাথে করে আনতে ভুলি নি। চাবিটা অদ্ভুত রকমের। স্বপ্নে এটাকে দেখার সময়ও অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। ঘুম ভাঙার পর এটাকেও আবিষ্কার করেছি। আমার চাবির সাথেই ছিল, একই পকেটে, যেখানে আমার চাবি থাকে। দেখো তুমি চাবিটা। সারাদিন সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি।

পকেট থেকে চাবিটা বের করতে অস্বাভাবিক বেশী সময় লেগে গেল। আমার হাত কাঁপছিল। তার উপর পকেটের এক কোণায় লুকিয়ে পড়েছিল শয়তানটা।

হাসান চাবিটা আমার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল

কৌতূহলী চোখে। কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

ঠিক এই চাবিটাই স্বপ্নে দেখেছি আমি। সেই একই রং, একই গড়ন, একই আকার, এমন কি ঘুম ভাঙার পর হাতে নিয়েও দেখেছি আমি—সেই একই ওজন।

হাসান মাথাটা সরিয়ে আনল চাবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। একটু ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ সহকারে তাকাল আমার মুখের দিকে। কথা না বলে অমন করে তাকিয়েই রইল ও। তারপর আমার কাঁধে ভারী একটা হাত রাখল ও। সহানুভূতি দেখতে পাচ্ছি ওর চোখের দৃষ্টিতে।

খুব বেশী গোলমেলে ঠেকছে, না? কিন্তু ব্যস্ত হয়ো না কাহিল হয়ে পড়াটা স্রেফ বোকামি। ব্যাপারটাকে তুমি যেভাবে দেখছ সেভাবে না দেখে···।

এসব কথায় ফল হতে পারে না। আমি যা চাই তা কখখনো সহানুভূতি নয়। ব্যাখ্যা দরকার, ব্যাখ্যা চাই আমি। বুঝতেই হবে আমাকে এর রহস্য। তা না হলে আমার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, সন্তুষ্টি নেই, নিশ্চয়তা নেই···কিচ্ছু নেই।

ব্যস্তভাবে বললাম: হাসান, তুমি আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাও। এই একমাত্র উপায় আমাকে সাহায্য করবার। তুমি জান না, সারাদিন কি ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে আমার। মানুষ নেই আমি আর, আজব একটা প্রাণী বলে অনুভব করছি নিজেকে। পিছন থেকে তাড়া করছে সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক। কিছু একটা বলো, হাসান।

হাতের তালুতে চাবিটা ফেলে ওটার ওজন পরীক্ষা করতে করতে হাসান জিজ্ঞেস করল: তুমি কোথা থেকে এটা পেয়েছ, রহমান? মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, সর্বপ্রথম কোথায় দেখেছিলে এটা স্বপ্নে দেখার আগে?

দু'হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরলাম আমি হাসানের একটা হাত: কিন্তু হাসান, তুমি কি বুঝতে পার নি একটু আগে যেসব কথা তোমাকে শোনালাম? স্বপ্নে এটাকে দেখার আগে, আগে কখনো দেখি নি আমি। স্বপ্নেই প্রথম দেখেছি। তারপর ঘুম ভাঙার পর দেখতে পেয়েছি। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নে দেখা চাবিটার বাস্তব অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছি আমি।

তাহলে বোতামটার বেলাতেও তোমার বক্তব্য এই-ই?

হাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

হাসান মাথা নেড়ে বলে উঠল: স্থিরভাবে ভাবনা চিন্তা করতে পারছ না তুমি, আমার সন্দেহ হচ্ছে রহমান। না না, দাঁড়াও, শেষ করতে দাও আমার কথা। ভাল কথা, ঠিক কোন্ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তোমার? নিশ্চয় আঁচড়ের দাগ, বোতাম আর চাবিটার ব্যাপারে নয়, নয় কি? কিংবা, স্বপ্নটা সত্যি সত্যি দেখেছ বলে ভয় পাচ্ছ?

ওর কথা শুনে বুঝতে পারছি, আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারে নি এখনও। বুঝতে পারে নি আমাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নে দেখা জিনিসগুলো বাস্তবে সত্য বলে আবিষ্কার হয়েছে বলে প্রাণ ওষ্ঠাগত নয় আমার। ভয়ের কারণ অন্যত্র। স্বপ্ন এবং জাগরণের পরবর্তী ঘটনাগুলোর পিছনের অন্তর্নিহিত অর্থই আতংকের কারণ। যদি স্বপ্নে দেখা চাবিটা আমার পকেট থেকে না পেতাম তাহলে এ সমস্যা নিয়ে আবির্ভূত হতাম না হাসানের কাছে। একটা খবর হিসেবে পরিবেশন করতাম। কিন্তু আমি ভাবছি, এবং আমার ভাবনার পিছনে ব্যাখ্যা আছে—যদি স্বপ্নে দেখা চাবিটার বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সম্ভব তাহলে আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারিও

কোথাও না কোথাও থাকা সম্ভব। সম্ভব নয়, আছে, থাকতে বাধ্য। এবং সেই দেয়াল-আলমারির ভিতরে থাকা সম্ভব একটি লাশ। এক্ষেত্রেও শুধু সম্ভব নয়, আছেই, থাকতে বাধ্য। বাস্তব। ভয়ঙ্কর বাস্তব। বাস্তব সত্য। সেই লাশটা, যেটা জীবিত অবস্থায় আমাকে আঁচড়ে দিয়েছিল, আক্রমণ করেছিল। তারপর আমি তাকে হত্যা করেছি।

হাসানকে উপরোক্ত কথাগুলো বলবার প্রয়াস পেলাম। ওকে নাড়া দিতে খুব বেশী দুর্বলতা রয়েছে আমার কথার মধ্যে। কিভাবে বোঝাব, বুঝে উঠতে পারছি না। তবু বোঝাবার চেষ্টা করলাম ব্যগ্রভাবে।

আমার কথাগুলো বুঝতে পারছ না তুমি? এই চিটাগাং শহরে কোথাও না কোথাও ঠিক এই মুহূর্তে একটা ঘর আছে, এবং চাবিটা সেই ঘরেরই। সেই ঘরের ভিতরে একজন মৃত মানুষ না থেকেই পারে না। যদিও আমি জানি না সেটা কোথায়। জানি না, চিনি না লোকটাকে। কিম্বা জানি না, কেন আর কেমন করে ঘটল এমনটি। কিন্তু, কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই এতে যে, সেই জায়গায় আমি উপস্থিত ছিলাম, নিঃসন্দেহে আমি করেছি কাণ্ডটা, তা না হলে অকারণে কেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মাথায় ব্যাপারটা প্রবেশ করবে?

তুমি দেখছি সত্যি সত্যি মহা ফাঁপরে পড়েছ।

ঠোঁট কামড়ে চিন্তিত স্বরে বলল এবার হাসান। যোগ করল: You need a drink. এসো, কোথাও গিয়ে বসে বরং আলোচনা করে বিষয়টা তোমার সিস্টেমের বাইরে আনার চেষ্টা করা যাক।

হাসান শক্ত করে চেপে ধরল আমার একটা হাত। বললাম: কফি ছাড়া অন্য কিছু নয়। Let's go where the lights are good

and bright.

হোটেল এ্যাণ্ড রেষ্টুরেণ্ট ডি প্যালেস-এ গিয়ে বসলাম আমরা।

আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাসানই প্রথম কথা বলে উঠল: ব্যাপারটা, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এবার যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক। রহমান, স্বপ্নটা তুমি আর একবার বলো তো দেখি?

আমি বললাম আবার

মাথা নাড়তে নাড়তে হাসান মন্তব্য করল: স্বপ্নের ভিতর থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছি না। যাই হোক, তুমি কি চিনতে মেয়েটাকে বা মেয়েটার মুখটাকে; বা জিনিসটা যাই হোক না কেন—মেয়ে, মেয়েটার মুখ বা অন্য কোনো বস্তু যা মেয়ের মতো দেখতে—চিনতে?

আমি টেবিলে আঙুল ঠুকে শব্দ করে বলে উঠলাম: না, এখনও আমি চিনি না, স্বপ্ন দেখার আগেও চিনতাম না। চিনেছিলাম কেবল স্বপ্ন দেখার সময়। ওকে দেখে কেমন যেন মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম আমি। যেন, যেন আমাকে ঠকিয়েছে ও, যেন···।

হাসান জেরা করল: স্বপ্নে তাকে চিনেছিলে, বলছ। বেশ। স্বপ্নে সে কে ছিল তাহলে?

তা জানি না। স্বপ্নে তাকে জানলাম, চিনলাম। কিন্তু এখন জানি না। চিনি না।

আচ্ছা, মেয়েটা কোনো সিনেমা অভিনেত্রী বা ওই রকম কিছু নয়ত? কোনো সিনেমার পর্দায় বা পত্র-পত্রিকার পাতায় ওই রকম মুখ তুমি দেখে থাকতেও পার। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না, রহমান। কিংবা, রাস্তাঘাটে, মাঠে, পার্কে পলকের জন্যে হয়ত চাক্ষুষ দেখে থাকতে পার মেয়েটাকে। এবং হয়ত মেয়েটার ছবি তোমার

অবচেতন মনে ছাপ রেখে গিয়েছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় সেটাই স্বপ্নে দেখেছ। এরকম সম্ভবতঃ ঘটতে পারে।

জানি না, আমি জানি না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু, আসলে পরিচিতিবোধটা প্রগাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছিল ওকে দেখা মাত্রই। এবং কেমন যেন একটা আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু এখন পরিচিতিবোধটুকু আর অবশিষ্ট নেই, আঘাত পাবার কোনো যৌক্তিকতাও দেখছি না।

লোকটা সম্পর্কে বল তো আবার ?

লোকটা যেই হোক, যে জিনিসই হোক, আমি তার মুখ দেখতে পাই নি। একেবারে শেষ মুহূর্তে হয়ত দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে অনেক। লাশটা দেয়াল-আলমারিতে ভরার পর যখন পাল্লা দু'টো ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল, তখন হঠাৎ কেন যেন আশঙ্কা করলাম আমি, অনুভব করলাম আমি যে, ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি তার সম্পর্কে। কিন্তু আর সময় পাই নি। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

হাসান স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করল আবার: আচ্ছা, এবার বলো দেখি আবার জায়গাটা সম্পর্কে? তুমি বলছ, তোমার আশেপাশে দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখ নি। এর আগে, অর্থাৎ স্বপ্নের আগে ওই ধরনের কোনো জায়গায় কখনো গিয়েছ তুমি? কিংবা সিনেমায়, কোনো ম্যাগাজিনের ইলাস্ট্রেশনে দেখেছ? অথবা তোমার পড়া কোনো গল্পে ওইরকম কোনো ঘরের বর্ণনা ছিল বলে মনে পড়ে কি?

না, না, না!

হাসান হাত নেড়ে যেন সরিয়ে দিল সম্পূর্ণ সমস্যাটা। বলল: তাহলে ভুলে যাও, ভুলে যাবার চেষ্টা কর স্বপ্নটাকে। ত্যাগ কর ও

সম্পর্কে সবরকম দুশ্চিন্তা। এখন দেখছি আমিও প্রভাবিত হয়ে পড়ব বলে সন্দেহ হচ্ছে তোমার মতো। শোনো, গতরাতে কি কি করেছ তুমি—স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যা-ই বলো তুমি, দেখার আগে বা ঘটার আগে ?

কিছুই না। রোজ রাতে যা যা করি তাই করেছি। বিশেষ কিছুই না, কোনো নতুন চিন্তা না, কোনো নতুন কাজ না। রোজ যেখানে খাওয়া-দাওয়া সারি সেখানেই খেয়েছি। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি সন্ধ্যার পরপরই।

হাসান বলে উঠল ঃ এখন শোনো রহমান, চাবিটার ব্যাপারে অতি সরল একটা ব্যাখ্যা দেয়া যায়। ব্যাখ্যা এর একটা আছেই, না থেকেই যায় না। এবং সেটা তুমি যা ভাবছ, আল্লাই জানে তুমি কি ভাবছ, তেমন কখনোই নয়। আর যাই হোক না কেন, চাবিটা তোমার কাছে সরাসরি স্বপ্ন থেকে আসে নি। হয় তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এটা দেখতে পেয়েছিলে, এবং এর অদ্ভুত গড়ন দেখে লোভ সামলাতে পার নি কুড়িয়ে নেবার···।

দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলাম আমি। বললাম ঃ না, না। ওভাবেই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম আমি সকালবেলা। ফল হয় নি ভাই কোনো। অমন স্বভাব আমার কোনোদিনই ছিল না, নেইও। যদি তাই হতো, তাহলে চাবিটা আমার পরিচিত, অন্ততঃ এটুকু ভুলে যেতে পারতাম না, হয়ত কুড়িয়ে আনার ঘটনাটা ভুলে গেলেও যেতে পারতাম। কিন্তু চাবিটাই যে আমার অপরিচিত। এরকম চাবি, মানে এই চাবিটা জীবনে একবারই দেখেছি আমি। এবং সেটা স্বপ্নে। তার আগে নিঃসন্দেহে দেখি নি।

তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, জীবনে কখনো কোনো জিনিস প্রথমবার দেখার পর ভুলে যাও নি, যাও না ?

না, তা বলছি না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলাম। আমার উত্তর শুনেও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হাসান। বললাম: কিন্তু তা সত্ত্বেও জোর করে বলতে পারি, এই চাবিটা স্বপ্নে দেখার আগে আমি দেখি নি, চিনতাম না, চেনার প্রশ্নই ওঠে না। এটাকে আমি কুড়িয়েও আনি নি। এটা সম্পূর্ণ, শর্তহীনভাবে একটা অজানা, অপরিচিত চাবি আমার কাছে।

হাত নেড়ে হাসান বলে উঠল অধৈর্যভাবে: ঠিক আছে, এই ব্যাখ্যাটা না হয় সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু আরো ডজন ডজন উপায়ে চাবিটা তোমার পকেটে প্রবেশ করতে পারে তোমারই অজ্ঞাতে। হয়ত তুমি কোনো হ্যাঙ্গারে বা সেল্‌ফে ঝুলিয়ে রেখেছিলে কোটটা, সেই হ্যাঙ্গারে বা সেল্‌ফে ঝুলছিল এই চাবিটা; যেভাবেই হোক নাড়া খেয়ে চাবিটা পড়ে যায়, পড়ে ঠিক তোমার কোটের পকেটেই।

কিন্তু আমার কোটের পকেটে ক্যাপ আছে দেখছ না? চাবিটার কি প্রাণ আছে, বোধ-শক্তি আছে, যে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়বে পকেটের ভিতর?

এমনও তো হতে পারে যে, পকেটের ক্যাপটা তখন বাইরে যেমন পড়ে থাকে তেমনি না থেকে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। কিংবা হ্যাঙ্গারের নীচে পড়েছিল চাবিটা। কেউ দেখতে পেয়ে ঢুকিয়ে রেখেছিল তোমার পকেটে, তোমার চাবি মনে করে।

কিন্তু গতকাল অসংখ্যবার পকেটে হাত ঢুকিয়েছি আর বের করেছি। কোথায় ছিল তখন চাবিটা? অসম্ভব। ঘুমুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওটা ছিল না। ছিল আজ সকালে। স্বপ্নে দেখার পর ঘুম ভেঙে যেতে পেয়েছি। তার আগে ছিলই না, পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ধরো, তোমার পকেটে চাবিটা ঠিকই ছিল, আসলে কোনো

কারণবশতঃ টের পাও নি তুমি। টের পেয়েছ আজ সকালে। দ্যাট উড বি ফিজিক্যালি পসিবল।

মেনে নিতে পারলাম না। কেননা হাসানের যুক্তি মেনে নেবার কোনো কারণ নেই। বললাম: আমার চাবির সাথেই এটা ছিল। আমার চাবির গোছা গতকাল রাত্রে শুতে যাবার আগেও বের করেছি আমি পকেট থেকে, তখন কোথায় ছিল এটা?

হাসান সত্যি সত্যি থমকে গেছে এতোক্ষণ ধরে ব্যর্থ যুক্তি দেখাতে দেখাতে। চুপ করে রইল ও খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল: বেশ, ভাল কথা। না হয় স্বীকার করা গেল, চাবিটা তোমার পকেটে গতরাতে শুতে যাবার আগে ছিল না। কিন্তু এতে করে প্রমাণিত হয় না যে, স্বপ্নটা স্বপ্ন নয় সত্যি।

নয়?

চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায়। বললাম: বরং উল্টোটাই কি সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না?

শোনো রহমান, এ ব্যাপারে কোনো অসম্পূর্ণ বক্তব্য থাকতে পারে না। এর একটা না একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য। হয় তুমি স্বপ্নটা দেখেছ, নয়ত দেখই নি। স্বপ্নে নয়, যা ঘটেছে তা বাস্তবে ঘটেছে। ছাব্বিশ বছর বয়েস তোমার, ছেলেমানুষ বলা চলে না তোমাকে। চিন্তা করো না বা ভয় পেয়ো না, তুমি ভবিষ্যতে সবই বুঝতে পারবে, ব্যাপারটা শুধু সময় সাপেক্ষ। যদি তোমাকে কেউ আঁচড়ে দিয়ে থাকে, যদি সে তোমার গলা টিপে গলায় দাগ বসিয়ে দিয়ে থাকে এবং তাকে যদি তুমি কুড়ুল দিয়ে নিহত করেই থাক —স্বপ্নে যেমনটি ঘটেছে—তাহলে এসব ঘটনাই একদিন না একদিন তোমার মনে পড়ে যাবে। স্বপ্ন যদি দেখে থাক তাহলে চাবিটা

তুমি অন্য কোথাও থেকে নিয়ে এসেছ বা অন্য কেউ দিয়ে গেছে, এটা মেনে নিতে হয়। স্বপ্ন থেকে চাবিটা বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এটা হয় না। সে ক্ষেত্রে তুমি যা দেখেছ তা স্বপ্নে দেখো নি, বাস্তবে করেছ, এবং সে কথা তোমার স্মরণে আসছে না এই মুহূর্তে, পরে আসবে। আমি সেই বহুকথিত কিংবদন্তি মেনে নিতে পারি। কিন্তু তোমারটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। লোকে স্বপ্নের ঘোরে বা ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে উঠে হাঁটাহাঁটি করে, শোনা গেছে। কিন্তু এই কিংবদন্তি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায় নি কখনো। যে লোক ঘুমের ঘোরে হাঁটে তার সাথে কোনো বস্তুর ধাক্কা লাগা মাত্র সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

আমি বললাম: কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাঁটি নি আমি। তাহলে জুতো জোড়া আমার ভিজে থাকত। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা দুপুর পর্যন্ত ভিজে ছিল। আমি জুতা পরীক্ষা করে দেখেছি।

হাসান গম্ভীর হয়ে উঠল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল: দেখো দেখি স্মরণ করতে পার কিনা, তা সে যতই তুচ্ছ হোক, যতই অনুল্লেখযোগ্য হোক, গতরাতে তুমি ঘর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বের হয়েছিলে কিনা, কিংবা কেউ তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছিল কিনা, অথবা কাউকে লক্ষ্য করে কিছু ছুঁড়ে মেরেছিলে কিনা।

না। পরিষ্কার মনে আছে আমার, প্রতিদিনের মতো বিছানায় শুয়েছি। তার আগে কোথাও বের হই নি। বিছানায় শোবার অনেকক্ষণ পর ঘুমিয়েছি এবং শোবার পর বাইরে বের হই নি।

চাবিটা আমার কাছ থেকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল হাসান। দিলাম আমি। আলাপের সমাপ্তি টেনে এবার ও বলে উঠল: তাহলে যা বললাম তাই। ব্যাপারটা আদৌ ঘটে নি।

আবার যোগ করল হাসান : হয় তুমি নিছক স্বপ্ন দেখেছ, নয়ত সত্যি সত্যি কাজগুলো তুমি নিজে, তুমি স্বয়ং করেছ। দু'টোর একটা। দু'টো একই সাথে সত্য হতে পারে না।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলে মাথা নেড়ে আমি শুধু বললাম : এক বিন্দুও সাহায্য করতে পারলে না তুমি।

হাসান সাথে সাথে উত্তর দিল : অবশ্য তুমি যদি চাও, স্বপ্নে একজন মানুষকে হত্যার অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করাটা তোমার কাম্য, তাহলে সত্যিই কোনোরকম সাহায্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। স্বপ্নের ভিতরে যে অপরাধ করে তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে স্বপ্নের ভিতরেই। বিচারও হবে স্বপ্নে। সাজা ভোগের ব্যাপারটা, সেটাও স্বপ্নের ভিতরেই ভোগ করানো উচিত।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরোবার সময় আমি বললাম : তোমাদের বাড়ীতেই রাতটা কাটাব আমি। উজ্জ্বল দিনের বেলা ছাড়া আমি আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছি না। রাহেলাকে এ সম্পর্কে কিছু বলো না, কেমন ?

বলব না, তোমার যখন ইচ্ছা নয়। কিন্তু আমার কথা শোনো, সব দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার চেষ্টা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

: উঁহু, শেষ অবধি দেখব আমি। সন্তুষ্ট হবার মতো কোনো ব্যাখ্যা না পেলে স্বস্তি নেই আমার।

কথাটা বললাম, কিন্তু আমার কণ্ঠের আশাহীনতা অনুভব করলাম নিজেই।

চার

ঘুম হলো না ভাল। তবে হয়েছে যে কিছুটা এটাই আশ্চর্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক তন্দ্রার মতো অবস্থায় কেটেছে। ঘুমোবার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। কিন্তু এক ঘণ্টার ঘুমে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেটেছে ঐ এক ঘণ্টা সময়। আর আর দিনের মতোই, শুধু পরশুদিনের রাতটা বাদ।

হাসান এলো কাপড়-চোপড় বদলে। সোফায় বসল ও। লেপ সরিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম আমি।

কেমন কাটল?

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, রাহেলা যাতে শুনতে না পারে।

: আর স্বপ্ন দেখি নি। কিন্তু তাতে ইতর-বিশেষ কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না। যদি পরিষ্কার, নিঃসন্দেহ ধারণা করতাম যে পরশুরাতে যা করেছি, যা দেখেছি তা স্বপ্নেই করেছি বা দেখেছি তাহলে গতরাতে তোমাদের এখানে থেকে যেতাম না, ফিরে যেতাম নিজের আস্তানায়, এমন কি আবার ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখবার আশঙ্কা মনে জাগলেও। কিন্তু এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি। যাক, এখন বলো, তুমি কি সাহায্য করতে চাও আমাকে?

আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল হাসান। বলল: কি রকম সাহায্য আশা করো তুমি আমার কাছ থেকে?

কি উত্তর দিতে পারি আমি? সাহায্য আমি চাই বটে, কিন্তু কি রকম সাহায্য? কিছুই যে জানা নেই আমার। সমস্যাটা যে কি, তাই যে ছাই পরিষ্কার নয়। তবু বললাম: তুমি পুলিশ বিভাগের অফিসার। চাবিটা তোমাকে দিয়েছি। বোতামটা আমার ঘরে আছে, সেটাও দেব তোমাকে। তোমার কাজ কি হতে পারে এ বিষয়ে, তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন? খুঁজে বের করো তুমি চাবিটা আর বোতামটা কোথা থেকে এসেছে। কেন এসেছে।

অধৈর্য হয়ে পড়ল হাসান। রীতিমতো বিরক্তিবোধ করছে ও। আমার প্রতি ওর প্রচুর ভালবাসা আছে, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু বারবার একই কথা শুনে শুনে এবং আমার সমস্যার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেয়ে নিজের উপরও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে ও। বলল: দেখো রহমান, এবার তুমি বন্ধ করো তোমার স্বপ্নের কথা। বেমালুম ভুলে যাবার চেষ্টা কর সব কথা, শুনছ? তোমার চাবি আর তোমার সেই বোতাম, এ দু'টোর কথা আর শুনতে চাই না আমি। চাবিটা আমার কাছে আছে, আমার কাছেই থাকবে, তুমি আর ওটাকে একবারের জন্যেও দেখতে পাচ্ছ না। এরপরও যদি আবার ঘ্যানঘ্যান করো তাহলে সাহায্য না করে উপায় থাকবে না। সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি একজন ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব সাথে করে।

আমি ছোটো একটা আয়না সেল্‌ফ থেকে তুলে নিয়ে মুখোমুখি ধরলাম। নিজের গলার দাগগুলো দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হাসানের দিকে তাকালাম।

আমরা দু'জন দু'জনার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম। কারো মুখে কথা নেই কোনো। নিস্তব্ধ ঘর। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা

যাচ্ছে না। কথা না বলে তাকিয়েই রইলাম আমি হাসানের দু'চোখের দিকে। আমার এই চিন্তাকুল দৃষ্টি ভাষায় কোনো বক্তব্য পেশ করার চেয়ে ঢের অর্থবহ।

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বাকী রইল না হাসানের। কিছু বলবার জন্যে তৈরী হলো ও। কিন্তু বলা ওর হলো না। রাহেলা নাস্তা সামনে নিয়ে ডেকে উঠল পাশের ঘর থেকে।

নাস্তা শেষ করলাম আমরা। রাহেলা আমার সম্পর্কে কিছুই টের পায় নি। হাসান ওকে কোনো কথা শোনায় নি। কিন্তু হাজার হোক মেয়ে মানুষের মন, কিছু যেন সন্দেহ করছে বলে ধারণা হলো আমার। আমার শরীর খারাপ করেছে কিনা, জানতে চাইল ও বারবার। সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলাম না। উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল ওর তাতে করে। গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে দেখল। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বারবার তাকাল হাসানের দিকে।

হাসান নির্বিকার। অফিসের উদ্দেশ্যে বের হবার প্রস্তুতি নিতে নিতে ঠাট্টা করে রাহেলার শঙ্কা দূর করার প্রয়াস পেল ও: রহমান একটা দেড় হাজার পাতার উপন্যাসের প্লট নিয়ে ভাবছে, নাম করে ফেলবে রাতারাতি।

কাজ হলো। রাহেলা মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো একটা কারণ খুঁজে পেল হয়ত এতোক্ষণে।

হাসান বেরিয়ে যাবার আগেই বিদায় নিলাম আমি। রাহেলা ছাড়তে চায় নি। কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ও বোধ হয় বুঝতে পারল, অনুরোধ করলেও ফল হবে না কোনো।

ওদের বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামতেই সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। যেমন হয়েছিল ওদের বাড়ী যাবার আগের সারাটা দিন।

রাস্তায় লোক চলাচলের কমতি নেই। কিন্তু কোনো লোককেই আমার মতো মনে করতে পারছি না। ওরা যেন মানুষ সব, আমি নই। আমি যেন আজব এক জীব। ভীত। আতঙ্কিত। শঙ্কিত। অসুস্থ।

অসহায় বোধ করছি। দুর্বলতা চেপে ধরছে। নিজেকে ছাড়া আর কিছু যেন অনুভব করতে পারছি না, আমি নিজে আর আমার নিজের ছায়া।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা দৈনিক পত্রিকা অফিসে গেলাম। বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মচারীদের সাথে আলাপ করলাম একটা বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যাপারে। অ্যাডভান্স করলাম দশ টাকা। তারপর ফর্ম নিয়ে লিখতে বসলাম বিজ্ঞাপনটা।

আমি ঠিক যেমনটি ছাপাতে চাই তেমনটি লেখা প্রচুর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ডজনখানেক ফর্ম নষ্ট করলাম। মন সায় দিল না, কিন্তু কাজ চলবার মতো হয়েছে বলে বোধ হলো। লিখলাম :

আবশ্যক

শৌখিন পার্টি কর্তৃক বিশেষ ধরনের কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ী ভাড়া নিতে বা কিনতে আগ্রহী। বিশেষ কক্ষ-বিশিষ্ট অর্থে আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারি সম্বলিত কক্ষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবস্থান, আয়তন ইত্যাদি জরুরী তথ্যসহ সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগা-যোগের ঠিকানা : দৈনিক খবর, বক্স নং ক, ৩২৫১।

প্রথম দু'দিন প্রতিক্রিয়াহীনভাবে কাটল। তবে অবাক কাণ্ড বলা চলে না এটাকে। মনে মনে যুক্তি খুঁজে দেখলাম। কোনো বিজ্ঞাপন

একবার মাত্র দেখে কৌতূহলী বা আগ্রহী হওয়া যায় না। দ্বিতীয় দিন দেখলে বিশ্বাস জন্মাবে। দ্বিতীয় দিন যদি চিঠি লেখে কেউ তাহলে তৃতীয় দিনের আগে সে চিঠি পত্রিকা অফিসে পৌঁছুবেই না।

তৃতীয় দিন পত্রিকা অফিসে গেলাম। দু'টো চিঠি পেলাম। একটা হাবিব ওসমানী নামে এক ভদ্রলোকের। রাঙামাটিতে ভদ্রলোকের বাড়ী। তিনি সেটা বিক্রি করতে চান। তাঁর বাড়ীর একটি মাত্র ঘর, তিনি স্বীকার করেছেন, আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারি সম্বলিত নয়—চারটি।

বাতিল করা গেল হাবিব ওসমানীর প্রস্তাব।

দ্বিতীয় বাড়ীটা চাটগাঁ শহরের উপকণ্ঠে। মালিকের নাম মিয়া মোহসীন। তাঁর ডাইনিং-রুমটা আটটি কাঁচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়াল আলমারি নেই বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের ধারণা, আমি সেই দেয়াল ঘেরা ডাইনিং-রুম দেখে পছন্দ না করে পারব না।

আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারিসহ একটি ঘর খুঁজছি আমি, আটটি কাঁচের দেয়ালসহ কোন কিছু নয়। সুতরাং বাতিল হলো দ্বিতীয়টাও।

চতুর্থ দিনে কোনো চিঠিপত্র পেলাম না।

পঞ্চম দিনে পেলাম আধ ডজন চিঠি। চিঠিগুলো খুলে পড়া শুরু করার আগে একটা চিন্তা জাগল মনে—চিটাগাং শহরে আটটি কাঁচের দেয়াল-আলমারিওয়ালা ঘর আছে এমন বাড়ী এতো বেশী সংখ্যক? চিঠিগুলো খোলার পর অবশ্য চিন্তার গুরুত্ব হারাল। না, অতোগুলো বাড়ী নেই। ছয়টা চিঠির মধ্যে পাঁচটাই লেখা হয়েছে কন্ট্রাক্টরদের তরফ থেকে। প্রস্তাব দিয়েছে, কিস্তিবন্দী টাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব হলে তাদের ফার্ম তৈরী করে দিতে

পারে পছন্দ এবং আবশ্যক মতো বাড়ী, বিশেষ ধরনের দেয়াল-আলমারিসহ কক্ষ সমেত।

সর্বশেষ চিঠিটা একজন প্রকৃত বাড়ীওয়ালা লিখেছেন। ভদ্রলোক একজন সিনেমা অভিনেতা। তিনি লিখেছেন, তাঁর একটি ডেসিং-রুম আছে। সেটা আটটি আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারি নয়, আটটি স্বয়ংক্রিয় আয়নার স্ক্রীন ফিট করা ড্রেসিং-রুম। স্ক্রীনগুলো ইচ্ছামত সরানো যায়। ফলে চার, ছয়, আট বা তারও বেশী কোণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

ফোন নাম্বার দেখে ডায়াল করলাম ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক থাকেন হোটেলে। পাওয়া গেল সময়মত। কথাবার্তা হলো। নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিলাম আমরা। বাড়ীটা আমি দেখতে চাই।

পরদিন ভদ্রলোকের হোটেলে গেলাম। চা-টা খাওয়ালেন। তারপর নিজের গাড়ী করে নিয়ে চললেন বাড়ীটা দেখাতে।

বাড়ীটা শহরের উপকণ্ঠে। অনেকটা গ্রামীন পরিবেশ। বিরাট নয়, ছোটো-খাটো বাড়ী। নিয়ম রক্ষা করার জন্যে বাড়ীটার বহিরাংশ দেখা শেষ করলাম অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর প্রবেশ করলাম অন্দরে। সর্বপ্রথম দেখতে চাইলাম ড্রেসিং-রুমটাই।

ভিতরে পা দিয়েই থমকে গেলাম আমি। ধ্বক করে উঠল বুকের ভিতরটা। ড্রেসিং-রুমটা বড় বড় আয়নার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গুণে দেখলাম, ছয়টা ভাগে ভাগ করা। ভদ্রলোক বললেন: আপনি যদি চান তাহলে আয়নাগুলো আট বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া যাবে।

ধরাধরি করে তাই করলাম আমরা। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলে উঠলাম: না।

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না আমার কথা। কিন্তু শব্দটা তিনি শুনতে পেয়েছেন। প্রশ্ন করলেন: কিন্তু আপনি আট কোণ-বিশিষ্ট রুম চান, তাই না? এটা তো এখন আট কোণ বিশিষ্টই।

আমি লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে যে, আটটি কোণ-বিশিষ্ট আয়নার দেয়ালগুলোর কোনটাতেই এমন কোন ছিদ্র নেই যাতে একটা চাবি প্রবেশ করতে পারে। বিশেষ করে সেই দিন সকালে যে চাবিটা আমার পকেট থেকে পেয়েছিলাম, সেটা ঢোকার মতো কী-হোল কোথাও নেই। আমার 'না' বলার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই। কিন্তু ভদ্রলোককে বলা চলে না ব্যাপারটা। তাই বললাম: পরে জানাব আমি আপনাকে।

ফিরে এলাম আমি ভদ্রলোককে নিরাশ করে।

বিজ্ঞাপনটা দৈনিক খবরে নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকল। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেল না আর। অবশেষে বাতিল করে দিলাম বিজ্ঞাপনটা নিরাশ হয়ে।

ইতিমধ্যে হাসান বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয় দেখেছিল এবং কাজটা যে আমারই তাও বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়। খবরের কাগজ পড়া কোনো দিনই বাদ দেয় না ও। সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার সময় সবক'টা কাগজ নিয়ে বসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সব খবর।

বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হচ্ছে না দু'দনি থেকে। আজ রবিবার। সকাল।

বেলা দশটায় আমার ঘরে আবির্ভাব ঘটল হাসানের। ওকে দেখেই ধারণা হলো, কোথায় যেন যাবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে ও।

বললাম: এসো, বসো।

না।

হাসতে হাসতে দরজার কাছ থেকেই যোগ করল ও ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আর রাহেলা গাড়ী নিয়ে সারাটা দিন শহরের বাইরে ঘুরে ঘুরে কাটাতে যাচ্ছি। রাহেলা বুদ্ধিমতীর মতো খাবার দাবার সাথে নিয়েছে মোট তিনজনের মতো।

কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। বলল: তোমার কথা স্মরণ করেই ওর এই ব্যবস্থা। তাই, এবং আমি তোমার সঙ্গ পেল দেদার সিগারেট আর চা পান করার সুযোগ পাব বলে সর্বান্তকরণে কামনা করছি যে, তুমি আমাদের সাথে যেতে আপত্তি করবে না···।

রীতিমতো বক্তৃতা জুড়ে দেবার ভাবভঙ্গি শুরু করে দিল হাসান। আসলে রাহেলার যতটুকু ইচ্ছা তারচেয়ে কম নয় ওর আমাকে সাথে নিয়ে যাবার। বললাম: দেখো, আমার চার দিকের আবহাওয়া এখনো দূষিত হয়ছে বলে মনে হয় না। বেশ আছি আমি। ঘুরে বেড়িয়ে মুক্ত বায়ু সেবনের মাধ্যমে দূর হবে না আমার সমস্যা। কিংবা ভুলে থাকতে পারব না সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা। সুতরাং আমি যাচ্ছি না। ক্ষমাপ্রার্থী হচ্ছি এবং ধন্যবাদান্তে।

এবার হাসান আর বক্তৃতার মহড়া দেবার চেষ্টা পেল না। রীতিমতো বক্তৃতা ঝাড়তে শুরু করল। আর, একজন গুপ্তচর বিভাগের লোক যখন যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনের সাহায্য নিয়ে কাউকে কাবু করার প্রয়াস পায় তখন সে বেচারার অবস্থা অসহায় পশুর চেয়েও করুণ না হয়ে কোনো উপায় থাকে না। আমারও সেই দশা হলো। রাহেলা গাড়ীতে বসে আছে আমাদের জন্যে। হাসান নাছোড়বান্দা, আমাকে না নিয়ে একা সে ফিরে যাবে না গাড়ীতে। আমার কোটটা হাতে নিয়ে একরকম জবরদস্তি করেই বের করে নিয়ে এলো আমাকে ঘরের ভিতর থেকে। নিজেই তালা দিল ঘরের। তারপর আগে আগে

হাঁটতে শুরু করল। অগত্যা অনুসরণ করতে হলো ওকে।

শুরু থেকেই জগাখিচুড়ি-মার্কা ঠেকল ওদের প্ল্যানটা। কোথায় যাবে তাই-ই জানে না। তার উপর গাড়ী চালাচ্ছে হাসান নয়, রাহেলা। অন্ধের মতোই অচেনা-অজানা রাস্তা দিয়ে চালাতে লাগল ও গাড়ী। গল্পে পেয়েছে হাসানকে। বর্তমানে যে-ক'টা কেস নিয়ে মহা ঝামেলায় দিন কাটছে ওর সেগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ জ্ঞান অর্জন হলো আমার।

রাহেলা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিল বেশ খানিকক্ষণ আগেই। প্রায় পাঁচ-ছয়বার ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে সে: এবার কোন্‌দিকে যাওয়া যায় বলো তো? সামনে দেখছি বহুদূর বিলম্বিত পিচঢালা পথ, বাঁ-দিকেও তাই, ডানে সরু একটা গলি। কোন্‌দিকে গেলে ভাল হয়?

আমরা ওর কথার গুরুত্ব বুঝতে পারি নি। আমরা নয়, আমি। হাসানেরই গুরুত্ব দেবার কথা। আমি তো নির্জীব, বলা চলে প্রাণহীন। রাহেলার কথা শুনছিলাম অর্থাৎ কানে আমার কথাগুলো প্রতিবারই ঢুকছিল, কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছিলাম না। মনোযোগ দেবার কথা হাসানের। কিন্তু ও মশগুল গল্প করতে। গল্প করা আর হলো না, রাহেলা সজোরে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ী। তারপর নাকি স্বরে বলে উঠল: এবার? সামনে যে রাস্তা নেই?

এবার গল্প বাদ দিয়ে হাসান আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সামনের দিকে। ধীরে ধীরে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠল ওর চোখে। বলল: আরে, এ কোথায় এসে পড়েছি আমরা! সামনে পাহাড়, আর তো যাওয়া যাবে না! ঘোরাও, গাড়ী ঘোরাও।

গাড়ী ঘুরিয়ে নিল রাহেলা। আবার ফিরতি পথে চালাল গাড়ী।

গল্প নতুন করে শুরু করার কোনো প্রবণতা আর দেখা দিল না হাসানের মধ্যে। এদিক-ওদিক চোখ ফেলে জায়গাটার পরিচয় জানার চেষ্টা করছিল ও। মিনিট তিনেক পর রাস্তার তে-মাথায় এসে পড়ল গাড়ী। রাহেলা জিজ্ঞেস করল: কোন্‌দিকে যাব এবার?

হাসান পাল্টা প্রশ্ন করল: যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সে রাস্তা দিয়েই আপাততঃ এগোনো যাক। চেনা রাস্তায় না পড়া অবধি কোন্‌দিকে যাব বুঝব কেমন করে?

রাহেলা শঙ্কিত কণ্ঠে বলল: কিন্তু তিনটে রাস্তার কোন্‌টা দিয়ে এসেছি, ভুলে গেছি যে?

সর্বনাশ! করেছ কি!

আঁতকে উঠল হাসান। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আবার বলে উঠল: মানুষজনের দেখা নেই, এ জায়গার নাম কি ছাই। কোনদিন এসেছি বলে তো স্মরণ হয় না।

ঘড়ি দেখল ও। রাহেলা ছেলেমানুষের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল: অচেনা জায়গা বটে, কিন্তু আর সব চেনা জায়গার মতই ঠেকছে আমার চোখে। উফ্, আমার কিন্তু ভয় লাগছে না···হারিয়ে যাবার দারুণ একটা আনন্দ আছে, তাই না?

হাসান বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে রাহেলার আনন্দে বাদ সাধার চেষ্টা পেল: তোমার আনন্দ হচ্ছে, না? ঝাড়া এক ঘন্টা গাড়ী চালিয়ে এই অপরিচিত, নির্জন জায়গায় নিয়ে এসেছে। ফিরতে লাগবে কমপক্ষে চারগুণ সময়। আজকের সারাটা দিনের প্রোগ্রামই মাটি করে দিলে!

রাহেলা উত্তর দিল: আমার দোষ দিচ্ছ কেন? বারবার করে জিজ্ঞেস করেছি, কোন্‌দিকে যাব। উত্তর দাও নি, গল্পে মেতেছিলে কিনা। এখন সামলাও।

হাসান আমার দিকে ফিরে জানতে চাইল: চুপ করে আছো কেন হে, চেন নাকি এলাকাটা? ছবি আঁকতে তো বহু জায়গা ঘুরতে হয় তোমার?

না ভাই, এদিকে কখনো এসেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

আমার উত্তর শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল রাহেলা। রাস্তার উপর থেকে পার্শ্ববর্তী মাঠের দিকে চালিয়ে দিল ও গাড়ী। মাঠের উপর থামানো হলো গাড়ী। উচ্ছল হাসিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে রাহেলা নামল গাড়ী থেকে। নামল হাসানও। আমার দিকে তাকিয়ে ও বোকার মতই জানতে চাইল: আচ্ছা, এতো হাসবার কি আছে, বলো দেখি?

রাহেলা আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলে উঠল: এই জায়গা আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। অর্থাৎ আমরা সত্যিসত্যি হারিয়ে গেছি।

হাসিটা সংক্রামক। রাহেলার হাসির কথা বলছি। হাসান আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারল না। হাসতে হলো আমাকেও।

আমাদের হাসি ফুটতেই নিভে গেল রাহেলার মুখের হাসি। খাবারের আয়োজনে লেগে গেল ও। সব তৈরী করা খাবার। ঝামেলা একেবারে হলো না। ফ্লাস্কের গরম কফি দিয়ে আহার-পর্ব সমাপ্ত করা হলো। সিগারেট ধরালাম আমরা। হাসি-ঠাট্টা চলল কিছুক্ষণ। কফি হলো আবার একবার। সিগারেটও।

দ্বিতীয় পালার সিগারেট শেষ হবার আগেই বেজে গেল চারটের মতো। এবং চারটে বাজার সাথে সাথেই প্রায় আকাশে মেঘের আকস্মিক ঘনঘটা দেখা দিল।

শীতকাল এরকম মেঘ করা সচরাচর দেখি নি। মেঘ তো

করেছেই, সেই সাথে ঝড়ের পূর্বাভাস দামাল বাতাসের ঝাপটায়। শঙ্কিত বোধ করলাম। বৃষ্টি না এসেই পারে না। তার আগে আমাদের অবস্থা কাহিল। শীতে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছি।

ড্রাইভিং-সিটে বসল এবার হাসান স্বয়ং। ফিরতি পথে শুরু হলো যাত্রারম্ভ। কিন্তু ফিরছি কি ফিরছি না, বোঝা মুশকিল। রাস্তা চেনা নয়। কোন্‌দিকে এগোচ্ছি, খোদা মালুম।

গাড়ী বেশ জোরেশোরেই চালাচ্ছিল হাসান। রাহেলাকে একঘরে করা হয়েছে শাস্তিস্বরূপ। হাসানের পাশে বসেছি আমি। রাহেলাকে পাঠানো হয়েছে পিছনের সিটে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছি মাঝে মাঝে ওর দিকে। হাসির ছিটে-ফোঁটাও নেই এখন ওর চোখে-মুখে। ভয় পাবার পূর্বাভাস, মুখ থমথমে।

বৃষ্টি শুরু হবার আগেই বজ্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল। তার পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি। সেই সাথে প্রবল গতিশীল বাতাস। স্পীড কমিয়ে দিল হাসান। সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। এখনও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত আমরা।

আশ-পাশে কোনো বাড়ী-টাড়ী দেখতে পেলে সেদিকেই নিয়ে যাও।

রাহেলা ভীত কণ্ঠে যোগ করল: এই ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতের মধ্যে গাড়ী না চালানোই ভাল। বিপদ একটা ঘটবেই।

হাসান বলে উঠল: আমি উইণ্ড-শীল্ড দিয়েও দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

কাঁচের সামনে ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করছে ও।

পাশের দু'ধারের রাস্তার দিকে চোখ ফেললাম আমি। বাঁ পাশে একটা পানির ট্যাঙ্ক। তার পাশেই পেট্রল-পাম্প একটা। পর পর

তিনটে বটগাছ—ডানদিকে। তারপর একটা ছোটোমতো মাঠ। মাঠের মাঝখানে শিমুলগাছ বেশ কয়েকটা।

আমি হাসানের উদ্দেশে বলে উঠলাম: আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে একটা গলি মতো পাবে, হাসান। ওই গলি দিয়ে গেলে, বেশ খানিকটা যেতে হবে, দেখতে পাবে বিরাট এক বারান্দাওয়ালা বাড়ী। আমরা আশ্রয় নিতে পারি ওখানে ঝড়-বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত।

ওরা দু'জন প্রায় একই সাথে প্রশ্ন করে উঠল অবাক কণ্ঠে।

হাসান জানতে চাইল: কিভাবে জানলে তুমি?

রাহেলা জিজ্ঞেস করল: তুমি কি এদিকে আগে কখনও এসেছ?

হাসানের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ওর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। রাহেলার প্রশ্নের উত্তরে বললাম: না।

এবং আমার উত্তরটা মিথ্যে নয়।

হাসান একটু পর বলে উঠল: এমনিতে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি তার মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারছি না কিছু, তার ওপর তুমি আবার গলি-টলির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আরো গোলমেলে করে ফেলবে না তো?

না, থেমো না তুমি, এগোতে থাক।

আমি আশ্বাস দিয়ে যোগ করলাম আবার: সরু মতো গলিটা তুমি পাবেই গলিটার দু'পাশে, গলির মাথায় আর কি, দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট আছে: দেখলেই চিনতে পারবে।

হঠাৎ চুপ করে গেলাম, যেমন হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছিলাম। কারণটা আর কিছু নয়, হাসান ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত এক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে স্বগতোক্তি করলাম আমি:

খোদা! জানি না, আমি জানি না কেমন করে জানতে পারছি এসব কথা।

মাঝ পথে থেমে গেলাম

হাসান একেবারে চুপ মেরে গেছে। নিঃশ্বাসও বুঝি নিঃশব্দে ফেলছে, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা হলো, ও বুঝি ভাবছে আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হবে। নিশ্চয় সামনে কোনো গলি নেই।

রাহেলা আমাদের দু'জনার কাঁধের মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ওঃ ওই তো ল্যাম্প-পোস্ট, দু'টোই তো। বাহ্‌বা, রহমান দেখছি গুণতে শিখেছ!

গাড়ী মোড় নিল। গলির ভিতর ঢুকে গেলাম আমরা। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না হাসান। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ও শুধু তাকিয়ে আছে আমার দিকে। রিয়ার-মিররের দিকে যতবার তাকাচ্ছি ততবারই দেখছি, ওর চোখ জোড়া আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে স্থিরভাবে। যেন পাথরের চোখ—নিষ্পলক।

এক মিনিট কেটে গেল। দেখা দিল বাড়ীটা। বিরাট বড় বাড়ী। ছাদওয়ালা প্রকাণ্ড বারান্দা বাড়ীটার সম্মুখে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সেই বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড় করালো হাসান গাড়ী।

গাড়ী থেকে নামার আগে রাহেলা প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু জিনিস-পত্র দিল। ফ্লাস্ক আর বিস্কুটের টিন পড়ল আমার ভাগে। ছুটলাম আমি গাড়ী থেকে নেমে। বারান্দা আর গাড়ীটার মধ্যবর্তী স্থানটুকুতে কোনোরকম আড়াল নেই, ফলে ভিজতে হলো সামান্য। হাসান ও রাহেলাও ভিজে ভিজে এলো বারান্দাটার উপর।

আমার সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে। বৃষ্টির ফলে নয়, এমনিতেই। কপালের জল মুছে ফেলেছি, তা সত্ত্বেও বিন্দু বিন্দু জল জমে উঠছে কপালে। জল নয়, ঘাম। ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিতে শুরু করেছে আমার কপালে। শুধু কপালে বললে অসম্পূর্ণ হবে, ঘাম দেখা দিয়েছে আমার সারা শরীরেই।

বারান্দাটা জরীপ করে নিলাম আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই। বৃষ্টির ছাঁট আর বাতাসের ঝাপ্টা থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবার উপায় নেই। ঠকঠক করে কাঁপছে রাহেলা। হতবাক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে হাসান ক্ষণে ক্ষণে। ওর সে দৃষ্টির অর্থ আমার কাছে অতি পরিচিত ঠোঁট দু'টো সজোরে কামড়ে ধরে উত্তেজনা, আতঙ্ক দমন করে আছি আমি। রাহেলা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল: কোনো ঘরের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে হতো।

হাসান বলে উঠল: বসতে পেলে শুতে চাও দেখছি। ঘরে ঢুকবে কেমন করে, দেখছ না তালা মারা দরজায়?

জানালার পাশে ওই লম্বাপানা বাক্সের ভিতরে চাবি আছে।

বলে ফেললাম আমি।

চমকে উঠল হাসান। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। লম্বাপানা একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। কাঁপছে ওর হাতটা থরথর করে। দেখতে দেখতে বের করে আনল চাবিটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মর্মর-মূর্তিতে পরিণত হলো হাসান। বিমূঢ় হয়ে পড়েছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিস্ফারিত চোখে। অসহায় ভঙ্গিতে বোবার মতো তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আস্তে আস্তে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কী-হোলে চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরাতে লাগল। হাতটা ওর কাঁপছে সজোরে।

খুলে গেল দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে আবার দেখল হাসান।

ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমি সকলের শেষে টলতে টলতে, আচ্ছন্নের মতো।

আমাদের চারদিকে সন্ধ্যা সমাগতকালীন আবছা আবছা অন্ধকার। অথচ সময়টা এখন বৈকাল। মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি বদলে ফেলেছে দিনের মৌলিক চেহারাটা। দেখলাম, রাহেলা দরজার ডান দিকের বোর্ডে আঙুল ঠেকিয়ে সুইচ খুঁজছে। বললাম: না না, ওটা নয়। তুমি যে বোর্ডে হাত রেখেছ তাতে হলের বাতির সুইচ নেই। বারান্দার বাতির সুইচ অবশ্য আছে। বাঁ দিকে দেখ হলের বাতির সুইচ বোর্ড আছে।

হাসান দরজার বাঁ দিকের পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল। সুইচ-বোর্ড দৃষ্টিগোচর হলো এবার, এতোক্ষণে আমরা বোর্ড দেখতে পাচ্ছিলাম না। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুইচ অন করল হাসান। জ্বলে উঠল আমাদের কয়েক গজ দূরে মাথার উপর উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক বাতি।

রাহেলা সম্ভবতঃ আমার কথার যথার্থতা পরীক্ষা করার মানসেই ডান দিকের বোর্ডের সুইচটা টিপে দিল। জ্বলে উঠল বারান্দার আলো। আবার অফ করল সুইচ। অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দা। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ও আমার দিকে মুখ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেই প্রশ্ন করল: ব্যাপার কি বলো তো? এতো কথা তুমি জানলে কিভাবে এই জায়গা সম্পর্কে?

হায়, রাহেলা! তুমি বাস করছ তোমার শান্ত, স্বাভাবিক, সুস্থ পৃথিবীতে।

রাহেলা দৃষ্টি বিনিময় করল হাসানের সাথে। হাসান বলে উঠল: আন্দাজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ব্যাপারে রহমান দেখছি সার্থক,

সৌভাগ্যবান।

হাসান চায়, রাহেলা রহস্যটা সম্পর্কে কিছু যেন না জানতে পারে।

আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম, বিরাট বড় এবং সজ্জিত একটা হল-ঘরে অবস্থান করছি আমরা। এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে সুদৃশ্য সিঁড়ি। রেলিং দিয়ে দু'ধার ঘেরা। দামী সেগুন কাঠের রেলিং।

রাহেলা এদিক ওদিক চোখ ফেলতে ফেলতে বলে উঠল: হল ঘরের অটোমেটিক তালা তো ভিতর-বার দু'দিক থেকেই খোলা বা বন্ধ করা যায়। বাড়ীর ভিতরে মানুষ-জন থাকতেও পারে, কি বল?

হাসান সিঁড়ির উপরপানে তাকিয়ে জোর গলায় ডাক ছাড়ল: বাড়ীতে কেউ আছেন কি?

তিন-চার বার ডাকা হলো। নেই কেউ। সাড়া পাওয়া গেল না কোনো। হাসানের প্রতিবারের ডাকার পরপরই রুদ্ধ কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম: অমন করো না, হাসান।

আমার কথায় কান দেয় নি ও। নিরাশ হতে হলো ওকে অবশেষে। রাহেলা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল: তোমাকে শীতে কাবু করে ফেলেছে? জোরে জোরে কাঁপছ যে?

হলঘর থেকে একটা বেড-রুমে গিয়ে ঢুকল ও। আমি আর হাসান দু'জনাই খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু পা বাড়ালাম না। আমাদের মাথার ভিতর এই মুহূর্তে অন্য এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। রাহেলা গরম কোনো জায়গা বা তেমনি কিছু একটা খুঁজছে প্রচণ্ড কনকনে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। বেড-রুমের পাতা কার্পেট দেখতে পাচ্ছি। আর সব আসবাবপত্র রাখার মাধ্যমগুলো খালি করা। সব জিনিস-পত্রই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। খোলা আলমারি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাতে জিনিস-পত্র কিছু

নেই। আসবাব-পত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে সাময়িকভাবে, বোঝা যায় পরিষ্কার। পিয়ানো, সোফা-সেট এবং চেয়ারগুলোর গায়ে ধুলোর আস্তরণ জমে আছে।

কোনো ডাক্তার বা বড় অফিসারের বাড়ী বলে মনে হয়।

রাহেলা সবজান্তার ভাব বজায় রেখে বলে উঠল আবার : সম্ভবতঃ বদলী হয়ে গেছেন অন্যত্র, তাই এমন ধুলো জমেছে। কিন্তু তালা-চাবির ব্যবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। ইলেক্‌ট্রিসিটিও চালু। আশ্চর্য বটে। তুমি পুলিশের লোক বলে বাঁচোয়া, তা না হলে এমনিভাবে বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লে সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

ঘরের ভিতর কোথাও থেকে বৈদ্যুতিক চুলো আবিষ্কার করে চেঁচিয়ে উঠল রাহেলা পরক্ষণেই। প্লাগ লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিল সেটা। হাত-পা গরম করার জন্য এরচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আপাততঃ কল্পনাতীত। সাময়িকভাবে ও আমাদের উপর থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল।

হাসানের দিকে তাকালাম আমি। পরপরই পিছিয়ে এলাম দরজা দিয়ে। সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে উঠে যেতে শুরু করলাম উপর পানে। নিঃশব্দে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, হাসানও পিছিয়ে এসে দরজা অতিক্রম করছে আমার মতো। আমারই মতো নিঃশব্দে। নড়তে চড়তে ভয়ানক স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছি। আমরা দু'জনাই।

একটা বেড-রুমে ঢুকলাম উপর তালায় উঠে। নীচের তালার মতোই অন্তঃসারশূন্য। মধ্যবর্তী দরজা অতিক্রম করে দু'মুখো বাথ-রুমে পৌঁছলাম। সেটা ছেড়ে প্রবেশ করলাম আর একটা বেড-রুমে। দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করে তৃতীয় বেড-রুমে পা দিলাম। সম্মুখস্থ উন্মুক্ত দরজা-পথে আমি দেখতে পাচ্ছি হলওয়ের বহিরাংশ। অপর একটা

দরজা-পথে নির্বাধায় আমি দেখতে পাচ্ছি নিজেকে—আমাকে। আমার প্রতিচ্ছবিকে।

তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করল আমাকে সিমেন্ট করা মেঝে। অস্বস্তি-ভরা আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠলাম। মর্মর-মূর্তির মতো জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছি। কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে আমাকে। যেতেই হবে। পা উঠালাম।

এগিয়ে এসেছি। কাছে চলে এসেছি। ঝুঁকে পড়ে পা বাড়াচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর আমাকে। দু'নম্বর আমাকে। তিন নম্বর আমাকে। চার, পাঁচ, ছয়, এবং সাত নম্বর আমাকে। দরজা পেরিয়ে এসেছি এখন আমি। দরজাটা চওড়া দেয়ালের সাথে চমৎকারভাবে খাপে খাপে মেলানো। দু'টো পাল্লাই আপনা-আপনি বন্ধ করে দিল দরজাটা আমার ধাক্কায়। সেই সাথে ঘাড় বাঁকিয়ে ভেজানো দরজার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম আট নম্বর আমাকে। দরজার পাল্লায় নিখুঁতভাবে লাগানো আয়নায় আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব।

থরথর করে কেঁপে উঠলাম আমি। বিস্মৃতকিমাকার হয়েছে আমার অবয়বের চেহারা। মাথার ভিতরে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড প্রলয়কাণ্ড। টলে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম—নয় নম্বর আমি।

হাসানের পদশব্দ সৃষ্টি হলো আমার পিছনে। সেই সাথে লক্ষ্য করলাম, আমার আট নম্বর প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার পাল্লা দু'টো দু'ফাঁক হবার সাথে সাথেই। এই মুহূর্তে সাতটি প্রতিবিম্ব। শুনতে পেলাম আমারই বিমূঢ়, কম্পিত, অস্ফুট আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর: এই সেই জায়গা! খোদার কসম ভাই, এই সেই জায়গাটা। ভুল হতে পারে না।

হুঁ।

গলার ভিতর থেকে ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো হাসানের। এক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা। হাসান বলে উঠল আবার : কপালের ঘাম মুছে ফেল, রহমান। তুমি শান্ত হবার চেষ্টা···।

কি ভেবে জানি না, হয়ত কথা বলতে ভীষণ ভয় লাগছে বলে অথবা কিছু একটা করে অস্বস্তি দূর করার জন্যে আস্তিন দিয়ে মুছে ফেললাম কপালের ঘাম। আমি বা হাসান কেউই এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি না এই মুহূর্তে।

তোমার সঙ্গে সেটা আছে, না নেই ?

হাসান জানে আমার কথার অর্থ। মাথা কাত করল ও। সেটা 'হ্যাঁ' কি 'না' তা বোঝার মতো সচেতনতা ইতিমধ্যে খুইয়ে বসেছি আমি।

হাসান পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে দেখে শিউরে উঠল আমার সর্বশরীর। পকেট থেকে ওর নিজের চাবির গোছাটা বের করে আনল ও। ওর চাবিগুলোর মধ্যে থেকে সেই চাবিটা খুঁজে বের করল ও। সেই চাবিটাই। সেই অত্যাশ্চর্য, অদ্ভুত চাবিটাই। পাশাপাশি তিনটে গোল রিং এর মাথার দিকটায়।···এই ধরনের চাবি, আমার মনে হয়, খুব কম তৈরী হয় এবং খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

দরজা মাত্র একটা। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছি আমরা। অবশিষ্ট সাতটার মধ্যে চারটেই এক একটা ড্যামি, নগ্ন ওয়াল-প্লাস্টারের সাথে আঁটা সু-আকৃতি বিশিষ্ট আয়না। খুব সহজেই বোঝা যায় ব্যাপারটা, কেননা চারটের কোনোটাতেই কী-হোল নেই। প্রতিটিই চারটে কোণকে বিভক্ত করে সুষমভাবে অবস্থান করেছে।

বাকী থাকে তিনটে।

হাসান তিনটের একটির কী-হোলে প্রবেশ করাল চাবিটা। সুষ্ঠুভাবে, সহজে প্রবেশ করল সেটা। যেন চাবিটা তৈরীই করা হয়েছে এই কী-হোলের জন্যে এবং মাপে। কাঠের ফ্রেমের পিছন থেকে ভেসে এলো একটা শব্দ—ক্লিক। খুলে গেল আয়না ফিট করা দরজা।

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে খেলে গেল ভয়ের শিহরণ। শূন্য মনে হলো তলপেটের ভিতরটা।

ভিতরে কিছু নেই। আয়না লাগানো দেয়াল-আলমারিটা শূন্য।

বাকী থাকে দু'টো।

রাহেলার বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর উঠে এলো নীচে থেকে: কি কাজে মেতেছ শুনি তোমরা ওপরে?

রাহেলা জানে না, আমারা কোন্ জগতে বিচরণ করছি। বলে উঠলাম হাসানের উদ্দেশে: ওকে খানিকক্ষণ অন্ততঃ নীচেই রাখতে হবে, হাসান।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। রাহেলার কাছ থেকে সবটুকু ব্যাপার লুকিয়ে রাখতে মনস্থ করেছিলাম কেন সে কথা এই মুহূর্তে স্মরণে নেই। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওকে কিছু না জানতে দেয়াই ভাল। মেয়েলোক বলেই সম্ভবতঃ।

হাসান রাহেলার উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে বলল: একটু অপেক্ষা কর, রহমান ওর প্যান্টটা শুকোতে চেষ্টা করছে।

রাহেলা উত্তরে বলে উঠল: ক্ষিদে পাচ্ছে যে আমার? জলদি এসো তাহলে।

আচ্ছা।

রাহেলা সংক্রান্ত ঝামেলা চুকিয়ে দ্বিতীয় কী-হোলে চাবি প্রবেশ করালো হাসান। আমি ভাবছি, কামনা করছি সর্বান্তকরণে, 'ক্লিক'

শব্দটা আর শোনা যাবে না। কিন্তু শব্দটা ঠিকই হলো। আমার কানেও তা পশল। এবং পরক্ষণে চোখ দু'টোর পাতা শক্ত করে বন্ধ করে ফেললাম মৃত্যু-স্পর্শী আতঙ্কে।

চীৎকার করেই বলা যায়, কিন্তু চাপা এবং আতঙ্কিত উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে হাসান উচ্চারণ করল: দেখো!

চীৎকারের শব্দে চমকে উঠে চোখের পাতা খুলে গেল আমার। দেখলাম, খোলা দেয়াল-আলমারির ভিতর, ঠিক মধ্যিখানে কালো কি যেন একটা বস্তু। পরমুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম···।

জিনিসটা একটা ভাঙা আয়রণ-সেফ। রঙটা কালো, কিন্তু শুধু মাত্র ডায়ালটার রঙ এখনো অবশিষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাঙা হয়েছে, না বলে বলা চলে কাটা হয়েছে। ফলে খাঁজ খাঁজ কাটার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

এটার আড়ালেই সে মাথা নুইয়ে ছিল প্রথম দিকে···সেই রাতে, তখন তাকে কাদার পিণ্ড বলে ভুল হচ্ছিল আমার।

নিজের স্বর শুনতে পেলাম আমি। আবার যোগ করলাম: এবং তার সামনে মেঝেতে নিশ্চয়ই একটা টর্চ ছিল। যার ফলে নীলচে আলোর সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই মেয়েটার মুখে নীলচে আলোর প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছিল অদ্ভুত একটা দৃশ্য, যেন মুখোশ পরিহিতা দেখাচ্ছিল তাকে।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল আমার ঠোঁট জোড়া। আমি পুনর্বার নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: এবং হাসান, হাসান ভাই, ঐ দেয়াল-আলমারিটা, একমাত্র যেটা অবশিষ্ট রয়েছে, যেটা এখনো তুমি খুলে দেখো নি, নিশ্চয়ই ওটাতেই তার লাশ ঢুকিয়ে রেখেছি আমি···।

সিধে হয়ে দাঁড়াল হাসান এবং তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল। পা

বাড়াল ও দৃঢ়ভাবে সেটার দিকে। যেন কথাগুলো বললাম ওর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যেই। কিন্তু তা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে আমার। ককিয়ে উঠে করুণ স্বরে অনুরোধ করলাম: কথা শোনো হাসান, থামো। এখন না। একটুখানি সময় দাও, আমাকে সুযোগ দাও একটা।

বাজে বকো না।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল হাসান, আমার হাতটা সরিয়ে দিল ঝাড়া দিয়ে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও। চাবিটা ঢুকিয়ে দিল কী-হোলের অভ্যন্তরে, তারপর বাঁ দিকে ঘোরাল। দরজার পাল্লা দু'টো ফাঁক হয়ে ভিতর দিকে ক্রমশঃ সরে সরে যেতে লাগল। উন্মুক্ত হচ্ছে দরজা। ধড়ফড় করছে, ছটফট করছে আমার বুকের মাঝখানটা।

হাসান দরজাটার একপাশে, অন্যপাশে আমি, মাঝখানে দরজাটা, হাতের ঠেলা দিয়ে পুরোটা খুলে ফেলল ও।

আমার চোখ দু'টো আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেছে।

নেই!

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর দিল হাসান। চোখ মেলে তাকালাম। দেয়াল-আলমারিটার ভিতর থেকে গড়িয়ে কোনো কিছুই পড়ে নি মেঝের উপর। না, একটা খড়-কুটোও পড়ে নি। অথচ ভিতরে কিছু নেই ও। একেবারে ফাঁকা। খালি। শূন্য। কিছুই নেই!

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল হাসান। দেয়াল-আলমারির গহ্বরস্থ চতুষ্পার্শ্বে জলন্ত কাঠিটা ওঠাতে নামাতে লাগল ও, যদিও বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে আমাদের পিছনে। কিন্তু বাল্‌বটা খুব কাছে নয় বলে পরিমাণ মতো আলোর অভাব দেখা দিয়েছে। দেশলাইয়ের

কাঠিটা যখন হাসানের হাতে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল ঠিক তখনই প্রথম দৃষ্টিগোচর হলো দাগটা। অনুজ্জ্বল, অস্পষ্ট, পুরনো দাগ। বলে দেবার দরকার পড়ে না ওটা কিসের দাগ হতে পারে। পুরনো রক্তের দাগ, নিঃসন্দেহে। দেয়াল-আলমারির গহ্বরস্থ কাঠের রঙ যেখানে হালকা মতো সেখানে রক্তের প্রকৃত বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, স্পষ্ট, কিন্তু খুব বেশী নয় পরিমাণে। একটা লাশের পিঠের ক্ষতস্থানের রক্ত শার্ট ভিজিয়ে দিয়ে ছাপ মেরেছে মসৃণ কাঠের গায়ে।

হাসান মেঝেটাও দেখল, কিন্তু মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া গেল না।

নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠিটা। মিলিয়ে গেল রক্তের দাগ।

অ'হত কোনো লোক ছিল এর ভিতরে।

ঢোক গিলে, কপালের ঘাম মুছে ফিসফিস করে বলে উঠল হাসান।

নিহত কোনো লোক ছিল।

কেঁপে উঠে সংশোধন করলাম হাসানের কথাটা।

পাঁচ

অবশেষে নামতে হলো নীচে। রাহেলার জবরদস্তি।

খাবার-দাবার কেন যে সাজিয়েছে ও, বুঝতে পারলাম না। দুপুরের আহার-পর্ব তো সমাধা হয়েই গেছে। এখন হয়ত বিকেল। কিন্তু আহার্য-সম্ভার দেখে সে কথা মনে হলো না। যেন জীবনে শেষ

বারের মতো খেয়ে নিতে হবে আমাদেরকে। হয়ত ঝড় বৃষ্টির দুর্ভোগ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে রেহাই পেয়ে এবং উপরি পাওনা হিসেবে এতোবড় আরামপ্রদ বাড়ীটা সাময়িকভাবে দখল করে মনের আনন্দ উপচে পড়ছে রাহেলার। তাই এই বাড়াবাড়ি।

রাহেলা ঠাট্টা-তামাশা করবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভারী মুশকিল ওকে সামলানো, যদিও সে চেষ্টা আমরা কেউই করছিলাম না। অনর্গল বকবক করছিল, অনর্গল খিলখিল হাসছিল। হাসান বিরক্ত হচ্ছিল স্বভাবতই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, রাহেলার কারণে বিরক্ত হয়ে বিরক্ত প্রকাশ করছিল ও রাহেলার উপর নয়, আমার উপর। ওর চোখ-মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখে সেকথা বুঝতে কারো বাকী থাকার কথা নয়। রাহেলার কথা আলাদা, নিজেকে নিয়েই মাতোয়ারা ও।

রাহেলার তরল ঠাট্টা তামাশা করার প্রচেষ্টায় কাজ হচ্ছে না কোনো। পরিবেশটা স্বাভাবিক নেই এখন আর। ভয়ানক অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এই অস্বাভাবিকতা টের পাচ্ছি আমি। হাসান তো পাচ্ছেই। ওরই সৃষ্টি এই পরিবেশ। ব্যঙ্গভরা চোখে বিদ্ধ করছে ও আমাকে। হঠাৎ, হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ঝট করে নামিয়ে নিচ্ছে মাথাটা। এই ভঙ্গীটুকুর পরিষ্কার অর্থ 'হুঁ, বুঝেছি তোমারই চালাকি।'

আমার ধারণা, রাহেলা যদি মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমাদের দু'জনার দিকে না তাকাত তাহলে হয়ত ও দাঁতে দাঁত চেপে জেরা করতে শুরু করত বা আমার শার্টের কলার চেপে ধরে কাণ্ড বাধিয়ে দিত একটা না একটা।

রাহেলা হঠাৎ বলে উঠল: কি ব্যাপার বলো দেখি, তোমরা

দু'জনাই কিছু মুখে তুলছ না যে!

হাসান উত্তর দিল: আমি তো খাচ্ছি। ওর ক্ষিদে নষ্ট হয়ে গেছে, কি করে মুখে তুলবে?

উচ্চারণে ঠাট্টার সুর পরিষ্কার বটে, কিন্তু বাক্য-বিন্যাসে পরিষ্কার ব্যঙ্গ।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বেড-রুমে এসে বসলাম তিনজনা। ঝড়-বৃষ্টির দাপট তুমুল হয়ে দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে বাইরে। ক্ষান্ত হবার কোনো আশা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। গা এলিয়ে দিল রাহেলা। তার আগে টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিয়েছে। ফেরদৌসীর ভাওয়াইয়া, সুচিত্রার রবীন্দ্র-সঙ্গীত, ফিরোজার নজরুল-গীতি পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় না রেখেই বেজে চলেছে একের পর এক। এদিকে তন্দ্রায় বুঁজে আসছে রাহেলার চোখ জোড়া।

শেষ পর্যন্ত সোফা-সেটের উপর ঘুমিয়েই পড়ল রাহেলা। হাসান এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল। উঠে চলে গেল ও হল-ঘরে। সেখান থেকেই, আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে, মাথা নেড়ে নির্দেশ দিল নিঃশব্দে। তারপরও আমার দিকে তাকাল না। ও জানত, তাকাবার দরকার নেই। জানত, আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি, ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করছি ভয়ে ভয়ে। এবং সেই সাথে, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি ওর মনের কথা, আমার ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও।

আমি ওকে সত্যিসত্যি ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করলাম। হল-ঘরে এসে দাঁড়ালাম আমি। সিরিয়াস কণ্ঠে ফিসফিস করে উঠল ও: দরজাটা বন্ধ করে দাও। রাহেলা এর মধ্যে মাথা গলাক তা আমি চাই না।

দরজা বন্ধ করে দিলাম যন্ত্রচালিতের মতো। ওকে আবার

অনুসরণ করে প্রবেশ করলাম কিচেন-রুমে। বাড়ীর সর্বশেষ প্রান্তে এই কিচেন-রুম।

হাসান আমার দিকে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম আমি। ওর এই দৃষ্টি আমার অচেনা নয়। কিন্তু ওর এই দৃষ্টি কোনোদিন আমার উপর পতিত হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। হাসান ওর পেশাদারী ভঙ্গীতে, পুলিশী-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এ রকম দৃষ্টিতে হেড-কোয়ার্টারে ধরে আনা সব অপরাধীর দিকে তাকায় ও।

একটা সিগারেট ধরাল ও। ঠোঁটেই ধরে রাখল সেটা। আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে না দিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সেটা। পুলিশ বিভাগের লোকেরা যাদেরকে সন্দেহ করে তাদেরকে সিগারেট দিতে অভ্যস্ত নয়।

শোনাও দেখি আর একটা স্বপ্নের কাহিনী!

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল হাসান।

চোখ নামিয়ে নিলাম আমি। বললাম: তুমি ভাবছ, আমি মিথ্যে কথা বলেছি, তাই না? কিন্তু···।

ওই পর্যন্তই বলতে পারলাম আমি। ক্ষেপে উঠল হাসান। চুপ করে যেতে বাধ্য হলাম আমি। ও আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠেলে ঠেলে পিছিয়ে নিয়ে গেল দেয়ালের গায়ে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, হাত দু'টো ওর এখনও পকেটে ঢোকানোই রয়েছে, পিছিয়ে নিয়ে গেল ও আমাকে চোখ রাঙিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে। তারপর শুরু করল ও যন্ত্রণাকর সংলাপ, যা বিদ্রূপাত্মক, ব্যঙ্গময় এবং অবিশ্বাসী: তুমি তাহলে জানতে, জানতে স্বপ্নের মাধ্যমে, কিভাবে এই বাড়ীতে ঢোকা যায়, না? স্বপ্ন স্বয়ং তোমাকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, বড় রাস্তার মুখে সরু মতো একটা গলি আছে,

আর সেই গলির দু'পাশে দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে, কেমন? বোঝাতে চাও, স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছ এই বাড়ীর হল-ঘরের চাবি কোথায় থাকত, না? স্বপ্নেই তুমি জেনেছিলে, বারান্দার বাতির সুইচ আর হল-ঘরের বাতির সুইচ ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় আছে, কেমন? পট্টি মারার জায়গা পাও নি, তাই না? তুমি জানো, কি করব তোমায় আমি? রাহেলার ভাই হও বা না হও, স্রেফ হাড়গোড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেব।

হাসানের উত্তেজিত ভাব দেখে বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তেই আমার হাড়গোড় গুঁড়ো করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে নিজের সাথেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে ওকে।

আমি যেন টলে উঠলাম। সিধে হয়ে দাঁড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে আমাকে।

হাসান ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দিলও না। শুরু করল থমথমে এবং সেই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে: তুমি ছল করে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল, কেমন? কিন্তু সৎসাহসীর মতো সব কথা স্বীকার করার পৌরুষ তোমার ছিল না। বলতে পারতে আমাকে, যদি সৎসাহসী হতে, 'হাসান, শহরের অমুক জায়গায় অমুক এক বাড়ীতে গতকাল গিয়েছিলাম আমি, সেখানে একজন লোককে খুন করে ফেলেছি, এই হলো সেই লোকের পরিচয়। আর অমুক অমুক কারণে তাকে আমি খুন করে ফেলেছি।' তা তুমি বলতে পার নি। উল্টো, আমাকে বোকা বানিয়ে নিজেকে সুচারুভাবে নিরীহ প্রমাণ করার কৌশল তৈরী করে ফেললে মনে মনে। আমাকে শোনালে মনগড়া, অবাস্তব, অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কথা। আমি বিবেচনা করতে রাজী আছি সেই লোককে, কিছু যায় আসে না সে যত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডই

ঘটিয়ে থাকুক, যদি সে খোলাখুলি আন্তরিকভাবে সব অপরাধ স্বীকার করে। অবশ্য আমার অপরিচিত কোনো অপরাধী যদি এককথায় সব অস্বীকার করে বা মিথ্যে কথা বলে রক্ষা পেতে চায় তাহলে সেটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা মানুষের প্রকৃতিই তারজন্যে দায়ী। কিন্তু অপরাধী যদি আমার আপন লোক হয়? অপরাধীর বোনের স্বামীর কাছে অপরাধী সত্য কথা স্বীকার করলে সে নিশ্চয়ই সহানুভূতি এবং বিবেচনাবোধ পাবে, তা সত্ত্বেও তাকে বোকা বানাবার প্রয়াস! এ ধরনের লোকগুলো কুকুর-বেড়ালের চেয়েও নোংরা, আর কপালে এদের মহা খারাবি লেখা আছে।···'দেখো, আমি এই অদ্ভুত চাবিটা পেয়েছি স্বপ্নের মধ্যে। কিভাবে এটা সম্ভব হলো? ···দেখো, আমি এই বোতামটাও পেয়েছি···!' 'আমার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা, কেমন? এই সব কথা শুনিয়ে আমাকে দিয়ে আদায় করিয়ে নিতে চেয়েছিলে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবার পরামর্শ, মেডিক্যাল অবজারভেশনে থাকার উপদেশ তাই তো?

ওর পকেটস্থ হাত দু'টোর মধ্যে থেকে অবশেষে একটি হাত বেরিয়ে এলো। সিগারেটটা ফেলে দিল ও। তারপর বের হলো অন্য হাতটা। সেটা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল জোরেশোরে। একগুঁয়ে কণ্ঠে উচ্চারণ করল ও: এবার শুরু করা যাক সত্যকথন। তোমার কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানবই আমি। তোমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারি কি না পারি, দেখা যাক। আমাকে তুমি অতো সহজ ভেবো না।

কথা শেষ করে সজোরে নাড়া দিল ও আমার কাঁধ ধরে। আমার মুখ খোলার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করছে ও, কিন্তু কি বলার জন্যে মুখ খুলব আমি?

: যে রাতে ঘটনাটা ঘটছে সে রাতে কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

কি করেছিলে তুমি এখানে এসে

বেকুবের মতো, অসহায়ের মতো মাথা নাড়ালাম আমি এদিক-ওদিক : কোনোদিন এখানে আসি নি আমি। এই বাড়ী, এই এলাকা জীবনে কোনোদিন দেখি নি আমি, শুধুমাত্র আজই তোমার আর রাহেলার সাথে এখানে এসেছি…।

চোয়ালের নীচে ঘুষি মেরে বসল হাসান। মাথাটা পিছন দিকে হেলে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালের সাথে।

যাকে তুমি খুন করেছ তার পরিচয় বল এখনও। লোকটার নাম কি ছিল? কত দিনের পরিচয় ছিল তোমার সাথে?

হাসান জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এমনিতেই মানসিক যন্ত্রণায় আধমরা হয়ে আছি আমি, তার ওপর অবুঝের মতো ঝামেলা বাড়াবার চেষ্টা করো না, হাসান।

খেদোক্তির মতো শোনাল কথাগুলো।

দ্বিতীয়বার আঘাত করল হাসান। এবার আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম আমি। লাগল বটে, ব্যথা পেলাম না খুব একটা।

উত্তর দেবে কিনা জানতে চাই, রহমান? দেবে কিনা বল?

আমি ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম : তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই হাসান, এর চেয়ে সত্য আর কিছু হতে পারে না, তা তুমি স্বীকার কর বা না কর। খোদাই তোমার প্রশ্নের উত্তর জানেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর। একমাত্র তিনিই শুধু জানাতে পারেন, কি ঘটেছিল যে রাতে আমি ঘুমে অচেতন ছিলাম।

আমার কথায় কাজ হলো খানিকটা। হাসান আমার কাঁধ ছেড়ে দিল না অবশ্য, কিন্তু ধাক্কা মারাটা বন্ধ করল। কিন্তু প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হল সাথে সাথেই : লোকটা কে ছিল? কেন তুমি তাকে খুন করেছ?

কেন? কেন? কেন?

একটু নড়েচড়ে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে ওর হাত থেকে। ওর লম্বা লম্বা হাত দু'টোর আওতার বাইরে সরে এলাম। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

হাসান আমার কাছে এগিয়ে এলো আবার: সহজে ছেড়ে দেব তোমাকে তা কিন্তু মোটেও ভেবো না। তোমার মতো বাকহীন লোক নিয়ে কারবার আমি আগেও করেছি বহু। কিভাবে কথার তুবড়ি ছোটাতে হয় তা আমার ভাল করেই জানা আছে। হয় তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলবে, নয়ত একজনকে খুন করার অপরাধে এক নম্বর শাস্তি দেব তোমাকে নিজের হাতের সুখ মিটিয়ে আধ-মারা করে—তা বলে দিচ্ছি!

যা করবে হুবহু তাই বলছে হাসান, পরিষ্কার বুঝতে পারছি। পুলিশী রক্ত গরম হয়ে ফুটতে শুরু করেছে চামড়ার নীচে। সবরকম সম্পর্কের কথা আপাততঃ ভুলে যাবে ও।

নিজের অজান্তেই নিজের মাথার চুলগুলো ধরে প্রাণপণে টানতে টানতে কয়েক পা সরে এলাম আমি। হাসান একটা চেয়ার কিচেন-রুমের মাঝখানটায় নিয়ে এলো এক পাশ থেকে। টেবিলটা এই মুহূর্তে আমাদের মাঝখানে। চেয়ারের উপর না বসে সেটার গায়ে একটা হাত রেখে আমার দিকে থমথমে মুখে তাকিয়ে আছে ও। চেয়ারটা হঠাৎ ছুঁড়ে মারবে না তো আমাকে লক্ষ্য করে? মনে মনে আশা পোষণ করলাম—না, আমার মাথা ফাটাবার ইচ্ছা হঠাৎ করে জাগবে বলে মনে হয় না ওর। ও শুধু আমার মুখ থেকে ওর সন্দেহ অনুযায়ী সদুত্তর পেতে চায়।

হাসানের জন্যে অন্ততঃ একজন আছে, সে হচ্ছি আমি, যাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্তর পাবার চেষ্টা করতে পারে ও। কিন্তু আমি যে রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কাকে প্রশ্ন করব? কার কাছে ছুটব আমি? কোথায় পালাব?

আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরে গেল ওর। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল দরজার দিকে।

দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজাটা আমার পিছন দিকে। হাসান দেখতে পাচ্ছে, দেখছে, কিন্তু না ঘুরে দেখতে পাবার কথা নয় আমার। আমার দিকে নয়, এখনও তাকিয়ে আছে ও দরজাটার দিকেই।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম দেখলাম, দরজায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে। হাতে একটা উদ্যত পিস্তল।

পর মুহূর্তে দ্রুত ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল সে: আপনারা দু'জন কি করছেন শুনি এখানে?

লোকটা ঘরের ভিতর একটা পা ফেলল।

চেয়ারের মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে নিল হাসান। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ও ধীরে-সুস্থে। বলল: We came in out of the rain, that suit you?

Identify yourselves - and hurry up about it.

লোকটার দ্বিতীয় পা এগিয়ে এল ঘরের মেঝেতে। এখনও পিস্তলটা উদ্যত। হাসান পরিচয়-পত্র বের করে ছুঁড়ে দিল: Help yourself.

অমনোযোগী কণ্ঠে কথাটা বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট

বের করল ও। সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। তারপর ধীরে ধীরে নির্বিকারভাবে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুকের দিকে।

স্যালুট করল আগন্তুক। একগাল হেসে বলে উঠল: মাফ করবেন, স্যার। কিন্তু আপনি···? স্যার, আমি নবকুমারগঞ্জ থানার ও. সি., হেদায়েত খান।

একটু থেমে, সম্ভবতঃ ঢোক গিলে আবার শুরু করল হেদায়েত খান: বাড়ীটার ওপর নজর রাখতে হচ্ছে আমাদেরকে। এদিক দিয়ে যাবার পথে থামব কিনা, ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, আলো জ্বলছে কিচেন-রুমে। কিভাবে ঢুকলেন, স্যার? আমরা তো জানতাম, বাড়ীটা তালাবদ্ধ সম্পূর্ণভাবে···।

বারান্দা সংলগ্ন জানালার সামনে একটা বাক্সে চাবি ছিল।

হাসান মৃদু স্বরে উত্তর দিল। কি যেন ভাবছে বলে মনে হলো।

ছিল নাকি? কি আশ্চর্য! গত এক সপ্তাহ ধরে এ বাড়ীর একটা চাবি রাতদিন আমার সাথে সাথে রয়েছে। ওটা নিশ্চয় স্পেয়ার। মজার ব্যাপার, আমরা জানতামই না যে দ্বিতীয় চাবিও আছে একটা।

হেদায়েত খান বেশী কথার মানুষ। আবার শুরু করল: আলো জ্বলতে দেখে ভিতরে ঢুকলাম আমি, তারপরই শুনতে পেলাম আপনাদের দু'জনার কণ্ঠস্বর···।

হেদায়েত খান কৌতূহলী স্বভাবতই। আমাদের দু'জনার হাবভাব তার কেমন কেমন ঠেকবারই কথা। কি হচ্ছিল আমাদের দু'জনার মধ্যে, কি কথা বলছিলাম ইত্যাদি জানতে চায় সে। সরাসরি জানতে চাওয়াটা সম্ভব নয় হাসানের গুরুতর পরিচয় পাবার পর। যদি হেদায়েত খান অন্য কোনো বড় অফিসার হতো তাহলেও তার প্রশ্নের উত্তরে আসল কথা বলতে রাজী হতো না হাসান। ওর মুখের

হাবভাব দেখেই বুঝতে পারছি তা আমি। ওর ধারণা, আমাদের মধ্যেকার ব্যাপারটা স্রেফ আমাদেরই নিজস্ব ব্যাপার।

আমি ভাবছিলাম, হয়ত ছিঁচকে চোর-টোর চুরি করার মতলবে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে··· ।

হেদায়েত খান আবার যোগ করল। হাসান এতোক্ষণ পর একটা প্রশ্ন করল: ঠিক এই বাড়ীটাকে নজরে রাখার উদ্দেশ্য এবং কারণটা কি ?

স্যার, গত সপ্তাহে এখানে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

আমার অস্তিত্বের উপর কে যেন আক্রমণ করতে আসছে, হঠাৎ করে তৃতীয়বার এইরকম অনুভব করলাম আমি।

হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে।

হাসান হেদায়েত খানের কথার শেষ তিনটি শব্দ অর্থহীনভাবে উচ্চারণ করল। ওর প্রতিধ্বনিতে প্রশ্নবোধক চিহ্নও নেই। কয়েকটা মুহূর্তের আয়ু শেষ হয়ে যাবার পর বলল: আমি ব্যাপারটা সম্পর্কে সব কথা শুনতে চাই। এ সম্পর্কে সব কিছু।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে আবার সিগারেট বের করল হাসান। একটা চেয়ারে বসল। হেদায়েত খানকে দেখিয়ে দিল একটা চেয়ার ইঙ্গিতে। আমার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল: সিগারেট চাইছ ?

প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল তিন নম্বর চেয়ারের পায়ার কাছে, যেমন ভাবে কুকুরের দিকে খাবার ছুঁড়ে দেয়া হয়। না, ঠিক সেরকম নয়। কুকুরকে ভালবাসে লোকে, নিয়মানুযায়ী। আমি এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলাম। সিগারেট বের করে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেরত দিতে যাব, এসময় হাসান আবারও আমার দিকে না তাকিয়ে বলে উঠল হেদায়েত খানের উদ্দেশ্যে: সিগারেট খান।

হাসান সম্মানের অপব্যয় করে না, জানি। হেদায়েত খান অবশ্য প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পিছপা, জানলাম। সিগারেটের প্যাকেটটা তাকে দিলাম, কিন্তু সে ফেরত দিল হাসানকে: আমি কম খাই সিগারেট।

কিচেন-রুমটা অব্যবহৃত। ভাঙা-আধভাঙা চেয়ারগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা এখানে-সেখানে। ভাল চেয়ার মাত্র তিনটেই, তিনজন বসেছি আমরা।

হেদায়েত খান আমার এবং হাসানের দিকে মুখ করে বসেছে, কথা বলার সময় আমার দিকে সে তাকাল না যদিও একটিবারও। আমাকে গুরুত্ব দেবার কোনো কারণ সম্ভবতঃ সে দেখতে পায় নি। দেখার মতো তেমন কিছু ছিল না বটে, শুধু আমি মৃতপ্রায় পর্যায়ে পৌঁছে আছি এটুকু ছাড়া।

এই বাড়ীটা মিঃ কায়েস এবং মিসেস্ কায়েস নামক এক দম্পতীর।

হেদায়েত খান আরম্ভ করল সবকিছু শোনাবার জন্যে। একটু ভেবে নিলো সে নতুন করে শুরু করার আগে। হাসান অনর্থপূর্ণ এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমাকে জরীপ করে নিল। মিঃ কায়েসের নাম শুনে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো কিনা বুঝতে চায় ও। কিন্তু কি প্রতিক্রিয়াইবা হতে পারে আমার, ওই নামের কাউকে আমি চিনলে তো? ওই নামের সাথে আমার পরিচয় নেই তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে?

মিঃ কায়েস সচরাচর ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বিদেশে থাকতেন। যখন অশুভ ঘটনাটা ঘটেছে তখনও তিনি বাইরে অবস্থান করছিলেন। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে, আমরা এখনো ভদ্রলোককে দুঃসংবাদটা জানানোর জন্যে সামনে পাই নি। মিসেস্ কায়েস ছিলেন খামখেয়ালী ধরনের···।

ছিলেন··· ?

আমি পরিষ্কার বুঝলাম শব্দটা উচ্চারণ করার সময় হাসানের নিঃশ্বাস আটকে গিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। হেদায়েত খান ওর কথাটা শুনতে পায় নি। নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে চলল সে: পাশের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, মিসেস্ কায়েস অবশ্য স্বামীকে লুকিয়ে খামখেয়ালীপনা করতেন না। তবে নানা কানাঘুষা শুনতে পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলা সম্পর্কে, যদিও কোনো অভিযোগই প্রমাণিত করে নি কেউ। এক যুবকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন, এবং যুবকটির সঙ্গ তাকে আনন্দ দিত বলে জানা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কোনো বিশেষ অর্থবহন করে না। কেননা, যুবকটি মিঃ কায়েসের সাথেও সমান বন্ধুত্ব বজায় রাখত বলে প্রকাশ। এবং তিনজনকে প্রায়ই একসাথে দেখা যেত। যুবকটির নাম 'ছিল' মকবুল হোসেন···।

এবার আমার মাথার ভিতর একটা প্রশ্ন নিঃশব্দে প্রতিধ্বনি তুলল: ছিল ?

হেদায়েত খান দম নিয়ে নতুন দিক থেকে আরম্ভ করল, নির্বিকার কিন্তু নাটকীয়ভাবে: একজন দুধওয়ালা দুধের গামলা মাথায় করে যাচ্ছিল, পাকা রাস্তাটা দিয়ে। এই বাড়ীর নিজস্ব আওতাধীন সরু গলি মতো রাস্তাটার মুখে, যেখানে দু'টো ল্যাম্প-পোস্ট পোঁতা আছে, সেখানে সে দেখতে পায় ঝোপ-ঝাড়ের পাশে ছেঁড়া-খোড়া কাপড় জড়ানো একটা বস্তু। তখন সবেমাত্র সকাল হচ্ছে, দিনটি ছিল মঙ্গলবার। আবছা আবছা অন্ধকারে ভাল দেখতে পায় নি দুধওয়ালা বস্তুটাকে। ভাগ্য ভাল, লোকটা ছিল কৌতূহলী। এগিয়ে যায় সে, দেখে বস্তুটা আর কিছু নয়, একটা দেহ। দুর্ভাগিনী মিসেস্ কায়েসের দেহ।

মৃতদেহ ?

আমি কি হত্যাকারী

হাসানের প্রশ্ন।

মৃতপ্রায়। নিশ্চয় নিজের আহত দেহটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে-হেচঁড়ে মেইন রো.ড়র দিকে নিয়ে যাবার অসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন তিনি। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা আর কি। কিন্তু একে রাত্রিকাল, তার ওপর মেইন রোডটা দিয়ে গাড়ী চলাচল তখন পর্যন্ত শুরুই হয় নি। লোক চলাচলও হয় কিনা সন্দেহ। রাস্তাটা এখনও শেষ হয় নি, আড়াই মাইল এগিয়ে গিয়ে থেমে আছে কাজ। রাত্রিবেলা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। চীৎকার করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না বলেই বুঝতে পারা যায়। যদি চীৎকার করেও থাকেন, শোনার মতো কেউ ছিল না আশপাশে। কোনো বাড়ী-ঘর খুব একটা কাছে-পিঠে নেই। দুধওয়ালা তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল। আরো দু'জন গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে আসে সে। তারা হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। দু'টো পা-ই ভেঙে গিয়েছিল, মেরুদণ্ডটাও। শরীরের সর্বত্রও অনেক জখম ছিল। ডাক্তাররা দেখেই বলেছিলেন, বাঁচার কোনোই আশা নেই। ঠিক তাই, পরবর্তী রাত্রির প্রথমদিকে মারা যান মিসেস্ কায়েশ। মাঝখানে, বেলা পাঁচটার দিকে বেশ খানিকক্ষণের জন্যে একবার শুধু জ্ঞান ফিরে এসেছিল তাঁর।

নিঃশ্বাস ফেলা এবং শ্বাস নেয়া যে এতো কষ্টকর ব্যাপার তা আমার জানা ছিল না এমনভাবে। প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবার দশা। অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করছি, শব্দ হচ্ছে জোরে জোরে।

হেদায়েত খান আমার দিকে কৌতুকভরে তাকাল, তারপর হাসানের দিকে ফিরে মৃদু হাস্যে বলে উঠল: আপনার সঙ্গী খুন-জখমের কথা শুনতে পারেন না, না স্যার? জানি, অনেকে অসুস্থ ফিল করে।

আমার জন্যে হাসানের মনে আর যেন কোনো দয়ামায়া নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে কি ভীষণ ঘৃণা করছে ও আমাকে, টের পেলাম। বলে উঠল : কি, হচ্ছে কি ?

কটুস্বরে তিরস্কার করে উঠল হাসান। এমনকি আমার দিকে না তাকিয়েই।

এই হলো বাস্তব ঘটনার একটা অংশ। প্রথমে এর বেশী কিছু জানতে পারি নি আমরা। পরে জানলাম, অবশ্য সেই দিনই, যে, একটা গাড়ী মিসেস্ কায়েসের ওই হাল করেছে। গাড়ীটা পাওয়া গেল। মেইন রোডের পাশে কয়েকটা গাছের পাশেই ছিল গাড়ীটা। গাড়ীর টায়ারে রক্তের দাগ এবং চুল পাওয়া গেছে। আর গাড়ীটা হচ্ছে মকবুল হোসেনের, আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

হেদায়েত খান নতুন বক্তব্যের সূচনায় বলল : রিপোর্ট পেয়ে ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী এই বাড়ীটা পর্যবেক্ষণ করতে এলেন। তিনি দোতালায় আয়না ফিট করা আট-কোণবিশিষ্ট একটি রুমে ঢুকে দেখেন, বাড়ীর আয়রণ-সেফটা ভাঙা এবং লুণ্ঠিত। আপনাকে স্যার দেখাব রুমটা···।

রাখো তোমার ওটা !

হাসান অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক মেরে উঠল। হেদায়েত খান চমকে উঠল। কিন্তু হেদায়েত খানকে নয়, ধমক মেরেছে হাসান আমাকে। ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ গিয়ে পড়েছিল আমার একটা মিট-সেফের ভিতর। হুইস্কির একটা বোতল দেখে চিনে ফেলি আমি। সেটা নিয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসে খোলবার জন্যে চেষ্টা করছিলাম, হাসান দেখে ফেলে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ধমক মেরে উঠেছে। যন্ত্রচালিতের মতো বোতলটা যথাস্থানে রেখে এসে বসলাম আবার। হেদায়েত খান দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, আমারই উদ্দেশ্যে :

যদি অসুবিধে বোধ করেন খুন-জখমের কথা শুনতে তাহলে বাইরে গিয়ে বসছেন না কেন ?

হাসান উত্তর দিল : আমি চাই, ও আমাদের সব কথা শুনুক। এসব ব্যাপার সহ্য করবার অভ্যাস থাকা উচিত, ভয়টা দূর করতে হবে।

ওর গলার স্বর ভয়ঙ্কর রকমের শান্ত।

ভাল কথা, আয়রণ-সেফের দশা দেখে আমরা কেসটা অনুমান করে নিলাম। বোঝা গেল গোটা সমস্যা এবং রহস্যটা। জানা কথা, এই ধরনের কেস দাঁড় করাতে হয় না, আপনা-আপনি দাঁড়িয়ে যায়। আমরাও দেখতে পেলাম, কেসটা চমৎকারভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাখ্যা করে ফেললাম সম্পূর্ণ ঘটনাটার : বন্ধু বলে পরিচিত সেই যুবক যার নাম মকবুল হোসেন, সে জানত বা জেনে নিয়েছিল, মিঃ কায়েস বাড়ীর বাইরে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে অবস্থান করলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে আয়রণ-সেফে মোটা অঙ্কের টাকা থাকে। ঘটনার দিন রাত্রে সে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ করে, মিসেস্ কায়েসের অজ্ঞাতে। কিংবা অনেক অনেক আগে থেকেই সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে লুকিয়ে ছিল। যাই হোক, রাত্রিবেলা মিসেস্ কায়েস অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। হয়ত আয়রণ-সেফ ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। ঘর থেকে বেরিয়ে উপর তালায় ওঠেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখে ফেলেন, মকবুল হোসেন তাঁর স্বামীর আয়রণ-সেফ নিয়ে এলাহি কাণ্ডে মেতে আছে। তারপর নিজের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে দৌড়ুতে শুরু করেন তিনি···।

ফোন ব্যবহার করেন নি কেন তিনি? তাছাড়া দৌড়ুবার দরকারটা ছিল কি ? প্রাণের ভয় জাগবারইবা কি কারণ ছিল ?

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হাসান।

সে কথা ভেবেছি বটে আমরা। কিন্তু ফোন করেও রেহাই পেতেন না মিসেস্ কায়েস। ব্যাপারটা তো কেবল পুলিশকে ডাকাতীর খবর জানানোতেই শেষ হবার ছিল না। মিসেস্ কায়েস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, মকবুল হোসেন তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যে তাঁকে হত্যাই করবে। মকবুল হোসেনের ভাবভঙ্গি দেখে এটুকু তিনি হয়ত পরিষ্কারই বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং না পালিয়ে উপায় ছিল না। ফোন করতেও তো সময় লাগত। ইতিমধ্যে প্রাণ হারাতে হতো এমনিতেও। যাই হোক, মিসেস্ কায়েস প্রাণভয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে মেইন রোডের দিকে দৌড়ে যেতে থাকেন। কিন্তু মকবুল হোসেন নীচে নেমে চড়ে বসে নিজের গাড়ীতে। গাড়ী বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। মিসেস্ কায়েস মেইন রোডের দিকে দৌড়ুচ্ছিলেন। মকবুল হোসেন তাঁকে অনুসরণ করে এবং পিছন থেকে ধাক্কা মারে গাড়ীর। দু'টো চাকা মিসেস্ কায়েসের ভূপতিত শরীরের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যায়। ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে দ্বিতীয়বার মিসেস্ কায়েসের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া হয়। মরে গেছেন বলেই বিশ্বাস জন্মে তার।

নিঃশ্বাস এবার যেন বেশ সহজে ফেলতে পারছি আমি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে না। বুকের কাছে একটা স্বস্তিবোধ দানা বেঁধে উঠছে অনুভব করছি। এবং শত শত বার নিজেকে শোনাচ্ছি একটি কথাই—'খোদা রক্ষা করনেওয়ালা, আমি গাড়ী চালাতেই জানি না।'

সিগারেটের প্যাকেট আবার বের করল হাসান। নিজেরটা জ্বালিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল প্যাকেটটা: সিগারেট খাও হে।

হেসে, সত্যি, কথাটা হাসান আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে

বলে উঠল।

মকবুল হোসেন গাড়ী নিয়ে পালাবার কথা চিন্তা করেছিল, আমাদের ধারণা হয়। কিন্তু আরো ভালো উপায় ভেবে পায় সে। গাড়ী নিয়ে পালাতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা, খুঁজে বের করতে খুব বেশীক্ষণ লাগবে না। তাই গাড়ীটা কয়েকটা গাছের আড়ালে রেখে পালায় সে। আমরা আসলে কেসটা এইরকমভাবে সাজানো হালে দেখতে পাই। অন্ততঃ এভাবে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে কল্পনা করে নিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু এই বিশ্বাস স্থায়ী হয় ঘটনার দিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা পাঁচটায়

হেদায়েত খান নাটকীয়তায় বিশ্বাসী। আবার আরম্ভ করল সে মকবুল হোসেনের খোঁজে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিলাম আমরা দুপুরের আগেই। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না তার। এদিকে হসপিটালে জ্ঞান ফিরে এলো মিসেস্ কায়েসের বিকেল পাঁচটার দিকে। ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী সে সময় উপস্থিত ছিলেন মিসেস্ কায়েসের বেডের পাশেই। মিসেস্ কায়েস জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম যে কথাটি বলে উঠলেন তাতেই, এককথাতেই, আমাদের কল্পিত সম্পূর্ণ কেসটা উল্টেপাল্টে গেল। মিসেস্ কায়েস বলে উঠলেন ঃ মকবুল কেমন আছে···মকবুল? লোকটা মকবুলকে খুন করে নি তো, না কি?

হেদায়েত খান স্রেফ নাটকীয় ধাঁচে দম নিয়ে আরম্ভ করলো আবার ঃ আমরা ভেবেছিলাম, অপরাধী নিশ্চয়ই মকবুল হোসেন। কিন্তু আমরা ভুল ভেবেছিলাম। মিসেস্ কায়েসের জবানবন্দি শুনে ছুটে এলাম এই বাড়ীতে। প্রথমে যেসব জায়গা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নি বেছে বেছে সেই সব জায়গা খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম।

আয়না ফিট করা আটটি দেয়াল-আলমারির দরজা খুলতে শুরু করলাম। চারটের দরজা খোলা গেল। তার একটির মধ্যে থেকে পাওয়া গেল যুবক মকবুল হোসেনের লাশ। তাকে পিছন দিক থেকে কুড়ুল জাতীয় ভারী কোনো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তার ফলেই মৃত্যু ঘটে। লাশটা আবিষ্কৃত হবার পর আমরা অকূল সাঁতারে ভাসলাম। আজও ভাসছি। রহস্যটা সম্পূর্ণ রহস্যময় হয়েই চোখের সামনে ঝুলছে আমাদের।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কোনো প্রশ্ন করল না হাসান। তারপর করল মোক্ষম সেই প্রশ্নটি: আসল হত্যাকারী সম্পর্কে কিছুই কি তাহলে জানা যায় নি?

জানা যায় নি মানে? সব জানা গেছে। কিন্তু তার কোনো সন্ধানই আমরা করতে পারি নি এ পর্যন্ত। সঙ্গের আট-কোণবিশিষ্ট রুমে মিসেস্ কায়েস একটা টর্চ লাইটের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে দেখেছিলেন হত্যাকারীকে। লোকটার সুচারু বর্ণনা দিয়ে গেছেন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে। মিসেস্ কায়েস হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলেন উপরতালার আয়না ফিট করা আট-কোণবিশিষ্ট রুমে। টর্চের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন তিনি হত্যাকারীকে। জ্ঞান ফেরার পর সব কথা জানবার মতো সময় তিনি দিতে পেরেছিলেন। সম্পূর্ণ জবানবন্দি লেখা আছে অফিসে

একমুহূর্ত মাত্র চিন্তা করল হাসান। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েই যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চলুন, অফিসেই যাওয়া যাক।

মৃদু স্বরে বলল ও: সব কথা যথার্থভাবে শোনা দরকার।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দরজার কাছে

গিয়ে বলল : এসো রহমান, তুমিও এসো। রাহেলার জন্যে একটা চিরকুট রেখে যাচ্ছি।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে রইল ও, যতক্ষণ না চেয়ার ছেড়ে আমি উঠলাম। উঠে দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করতেই অনুভব করলাম, পা দু'টো আমার অবশ হয়ে গেছে।

এসো, রহমান। আমি জানি, এসব তোমার লাইনের বাইরের ব্যাপার, তবু শেষ পর্যন্ত তোমার যাওয়া উচিত আমাদের সাথে

দ্বিতীয়বার আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল হাসান।

তোমার কোনো মায়াদয়া নেই নাকি!

কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করলাম আমি মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে এলাম দরজা দিয়ে

ছয়

গাউস চৌধুরী অল্পবয়সী পুলিশ ইন্সপেক্টর। আমরা অফিস-রুমে ঢুকতেই গাউস চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে অভ্যর্থনা জানালেন। হাসানের পরিচিত, বোঝা গেল কুশলাদি বিনিময়ের দৃশ্য দেখে। আমার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিল হাসান। তবে আমার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটতে দিল না। হেদায়েত খান মজা করার জন্যে আমাকে অতিরিক্ত ভীতু-প্রকৃতির বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করেছিল। হাসান তাকে সুযোগ না দিয়ে গাউস চৌধুরীকে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

হ্যাঁ।

হাসানের প্রশ্নের উত্তরে গাউস চৌধুরী ড্রয়ার খুলে একটা ফিতে বাঁধা ফাইল বের করলেন। ফিতে খুলে ফাইলটা ওল্টাতে শুরু করে বললেন: হ্যাঁ। আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার সম্ভাবনা প্রচুর। খুনীর চেহারার প্রায় নির্ভুল বর্ণনা পেয়েছি আমরা। মিসেস্ কায়েস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে জরুরী উপকারটা করে গেছেন। এই ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে হসপিটালে আমার সাথে মিসেস্ কায়েসের কথাবার্তার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু। আমি সঙ্গে একজন স্টেনো গ্রাফারকে নিয়েছিলাম।

ফাইল থেকে কাগজ-পত্র বের করলেন গাউস চৌধুরী। তারপর সেগুলোর একটিতে চোখ রেখে পড়তে শুরু করলেন: আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্ত মতে মিসেস্ কায়েসকে গাড়ী চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল মকবুল হোসেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মিসেস্ কায়েসকে গাড়ী চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাতে অবশ্য কোনো ভুল নেই। তবে মকবুল হোসেন কর্তৃক মিসেস্ কায়েস নিহত হবার পরিবর্তে মকবুল হোসেন এবং মিসেস্ কায়েস তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হয়েছেন। মিসেস্ কায়েস দেখেছিলেন ছোট কুড়ুলটা মকবুল হোসেনের পিঠে গেঁথে গেছে। তাই দেখে সচীৎকারে বাড়ী থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। আততায়ী মকবুল হোসেনের গাড়ী নিয়ে অনুসরণ করে এবং চাপা দেয় তাকে। হত্যাকারী তারপর ফিরে আসে পূর্বোক্ত জায়গায়। আয়রণ-সেফের সম্পদ সরাবার ব্যবস্থা করে এবং মকবুল হোসেনের লাশটা লুকিয়ে রাখে আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল আলমারির একটিতে। বাড়ীটা সে তালাবন্ধও করেছিল যতটা সম্ভব বেশী সময় পাবার জন্যে ...। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাতা নাড়াচাড়া করল খানিকক্ষণ গাউস চৌধুরী। তারপর বলল: স্যার, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, হত্যাকারীর বয়স হবে পঁচিশের মতো। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিটোল মাংসের আধিক্যহীন গাল। টর্চের আলো পড়ার ফলে গালের দু'দিকের দু'টো হাড়ের ছায়া পড়েছিল। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মিসেস্ কায়েস সেই শ্বাস-রুদ্ধকর পরিবেশে এও লক্ষ্য করেছিলেন, লোকটার মাথার সিঁথি ডানদিকে কাটা, সাধারণ লোকের মতো বাঁ দিকে নয়।

আমি চমকে উঠলাম চতুর্থ বার। আমার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমার গালে অতিরিক্ত মাংস নেই। ডান দিকে সিঁথি কাটা আমারই অভ্যাস। হাসান যখন আমাকে নিয়ে পড়েছিল তখন মাথার চুলে অঙুল চালিয়েছিলাম বলে মাথায় সিঁথির কোনো চিহ্ন নেই এই মুহূর্তে। কিন্তু আমি তো জানি।

লোকটার চোখ দু'টো ছিল অচঞ্চল, স্থির এবং দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ কাঁচের মতো, এখানে ঠিক স্বপ্নাচ্ছন্ন বা ভাবলেশহীন শব্দ দু'টো খাপ খাবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে মিসেস্ কায়েসের জবানবন্দি অনুযায়ী লোকটাকে দেখাচ্ছিল অপ্রকৃতিস্থের মতো।

দেখলাম, হাসান চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ তুলল।

শার্টের উপর একটা সোয়েটার পরেছিল লোকটা। এমনকি মিসেস্ কায়েস লক্ষ্য করেছিলেন যে, গলার কাছে সোয়েটারটা তালি দেয়া, এবং ওই স্থানের উলের রঙ আপেক্ষাকৃত হালকা ছাই রঙয়ের।

গত শীতে সোয়েটারটা রাহেলা নিজের হাতে তৈরী করে দিয়েছিল আমাকে। তিন-চারদিন পরই সিগারেটের আগুন লেগে পড়ে যায় গলার কাছে। নতুন জিনিসটা বাতিল করে দেয়া চলে

না। তাছাড়া রাহেলা আমাকে পরতে দেখবে বলেই কষ্ট করে বুনে দিয়েছিল। ওকে নিরাশ করতে মন চায় নি। মেরামত করার জন্যে ফেরত দিয়েছিলাম। কিন্তু হুবহু সেই উল অনেক খুঁজে-পেতেও পাওয়া যায় নি। অগত্যা অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের উল দিয়েই মেরামত করা হয় পোড়া যায়গাটুকু। এই মুহূর্তে সেটা আমার গায়ে নেই। বাসাতে রেখে এসেছি। কিন্তু সেই রাত্রে ছিল

চোখ সরিয়ে নিলাম। তাকালাম জানালা দিয়ে বাইয়ের দিকে। কিন্তু ঝাপসা হয়ে গেছে যেন আমার দৃষ্টি। যেন দেখতে পাচ্ছি না ভাল করে কিছু।

গাউস চৌধুরী বলে চলেছেন: ঘন্টা দু'য়েক লেগেছে আমাদের মিসেস্ কায়েসের কাছ থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে। একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিলেন তিনি। তবু যা বলতে পেরেছেন তা আশাতীত।

শুনতে পেলাম কাগজ-পত্র ফাইলে ঢুকিয়ে রাখার শব্দ। কেউ কোনো কথা বলল না খানিকক্ষণ। তারপর হাসানের কণ্ঠস্বর: ইতি-মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়েছে, কেমন?

তা তো নিশ্চয়। তবে মিসেস্ কায়েসের বেলায় সাময়িকভাবে, বিশেষ ব্যবস্থাধীনে। এদিকে মিঃ কায়েসের সাথে যোগাযোগ করতে পারি নি আমরা এখনও। যতদূর জানি, তিনি বার্মায় আছেন।

ফটো আছে ওঁদের?

আছে বৈকি। ওঁদের দু'জনার জীবিত অবস্থার এবং মৃত অবস্থার দু'টা করে চারটে ফটো আছে ফাইলে। দেখবেন নাকি?

বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, সামনে কি আসছে। শরীরের রক্ত জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে আমার। হাসানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা

করলাম আমি, নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ওকে সাবধান হবার অনুরোধ জানাবার জন্যে। ও যেন ফটোগুলো সকলের সামনে আমাকে দেখতে বাধ্য না করে। তারচেয়ে পালিয়ে যাই আমি, হাসান যদি অনুমতি দেয়। সহ্য করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে আমার অনেক আগেই, আর পারব না।

কিন্তু আমার দিকে ভুলেও না তাকিয়ে হাসান গাউস চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল হ্যাঁ, দেখা যাক

সেই একই ফাইল থেকে ইন্সপেক্টর বের করলেন ফটোগুলো। দেখলাম, বড় আকারের চারকোণা ফটোগুলো হস্তান্তরিত হচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে নিলাম আমি। শ্বাস ফেলতে পারছি না আর।

চোখ সরিয়ে রাখলাম বলে হাসানের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা হলো না। হঠাৎ অনর্গলভাবে কথা বলতে শুরু করে দিল হাসান। ফটোগুলো সম্পর্কেই। মিসেস্ কায়েসের এবং মকবুল হোসেনের মৃতদেহের ফটো সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল ও। হাতা মাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি সে সব কথার। আমার ধারণা বুঝতে পারছিল না বাকী দু'জনও। কিন্তু পরে বুঝতে বাকী ছিল না, এমন হঠাৎ বাক্যালাপ শুরু করার এবং বারবার প্রসঙ্গ বদলে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল ফটোগুলো যথাস্থানে আবার রেখে দেবার কথা ইন্সপেক্টরকে মনে করতে না দেয়া।

হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়াতে অন্ধকার হয়ে গেল রুমটা। মোম-বাতি জ্বালার পর হাসান বিদায় নিতে নিতে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে, খালি হাতে, আমার উদ্দেশ্যে বলল: এসো, রহমান।

দু'টো রুম অতিক্রম করে রাস্তায় এসে পৌঁছুলাম আমরা। হেদায়েত খান বলল: আমিই পৌঁছে দেব আপনাদের। আমার বাড়ী ফেরার

পথেই পড়ছে মিঃ কায়েসের বাড়ী।

হেদায়েত খান ড্রাইভিং সিটে। তার পাশে হাসান। আমি পিছনের সিটে উঠে বসবার উপক্রম করছি, এমন সময় হাসানের কণ্ঠস্বর কানে ঢুকলঃ দৌড়ে যাও দেখি রহমান, অফিস-রুমে ফেলে এসেছি বোধ হয় সিগারেটের প্যাকেটটা।

কথাটা আমাকে বলে আমার দিকে আর মনোযোগ দিল না হাসান। বারান্দায় দাঁড়ানো ইন্সপেক্টর গাউসের সাথে একরকম খোশগল্প জুড়ে দিল।

হাসানের কণ্ঠস্বর পিছনে রয়ে গেল এবং ইনার অফিস-রুমে আবার প্রবেশ করলাম আমি। এবার একা। আমি জানি, দ্বিতীয়বার কেন আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। হাসানের সিগারেটের প্যাকেট এখানে নিশ্চয়ই নেই। কেননা মিঃ কায়েসের বাড়ীতেই সবক'টা সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল ওর।

মোমবাতিটা জ্বলছে টেবিলের উপর। এগিয়ে গেলাম আমি টেবিলের দিকে। তাকালাম। চোখ বোলালাম। ওই যে ওগুলো, আমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে, হাসান কৌশলে টেবিলের উপর ফেলে রেখে গেছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। আমারই জন্যে।

স্ত্রীলোকটার ফটোটা সবগুলোর উপরে রাখা। মোমবাতির পাশেই বলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুখটা। ফটোটা হাতে তুলে নিতেই স্ত্রীলোকটার মুখ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। মৃত্যুর কালিমা, পাণ্ডুরতা, ছায়া, প্রাণহীনতা মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল। চঞ্চলতা ফিরে এলো যেন তার চোখের দৃষ্টিতে। যেন শুনতেও পাচ্ছি তার চেনা সেই কণ্ঠস্বর আবারঃ ওই যে, ওই যে লোকটা ঠিক তোমার পেছনে!

এদিকে আমার অন্যহাতে যুবকটির ফটোটাও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই, সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে যখন ওকে আহত করে ওর উপর ঝুঁকে পড়েছিলাম। ও যেন বলছে—"কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে আমার!"

এরপর কতক্ষণ জানি না, তবে খুব বেশীক্ষণ নাও হতে পারে, হয়ত দশমিনিট হবে, এই দশমিনিট আমি সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কখন জানি না ইলেকট্রিসিটি আবার ফিরে এসেছে। উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলছে আমার মাথার উপর। চোখ মেলেই আবার বন্ধ করে ফেললাম। তিন জোড়া পদশব্দ এসে থামল আমার সামনে, মেঝেতে, যেখানে আমি হাত-পা মেলে দিয়ে শুয়ে আছি। আমার মাথার উপরে ভারী একটা কণ্ঠস্বর বিস্ময়বোধক শব্দ উচ্চারণ করল। শুনতে পেলাম।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন নাকি!

আর একটা কণ্ঠস্বর, এটা হেদায়েত খানের: ফটোগুলো দেখে এমন হয়েছে মনে হয়, তাই না? এরকম খুন-খারাবির সাথে জড়িত ব্যাপারগুলো সইতে পারেন না, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। মিঃ কায়েসের বাড়ীতে আপনাকে যখন কেসটা সম্পর্কে বলছিলাম তখনও লক্ষ্য করেছি···।

ও সুস্থ নয়, বুঝলেন? একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছে কিছুদিন থেকে। এরকম জ্ঞানহারা মত প্রায়ই হয় ও। ও কিছু না।

শেষ কণ্ঠস্বরটি হাসানের। আমার মুখের সামনে বসে পড়েছে ও। মাথাটা আমার উঁচু করে ধরতে চোখ মেলে তাকালাম আমি। এক কাপ ঠাণ্ডা পানি ধরল ও আমার মুখে। আমি হাঁ করার আগে দুর্বল গলায় বলে উঠলাম: আমি···।

চুপ করো।

প্রায় ঠোঁট না নেড়েই চুপ করিয়ে দিল আমাকে হাসান।

আমি উঠে বসলাম। হাসান দাঁড় করাল আমাকে। গাড়ীর কাছে নিয়েও এলো হাত ধরে। অদ্ভুত উপলব্ধি বটে, যুক্তিগতভাবে ও এখন থেকে একজন শত্রু আমার, অথচ এভাবে সাহায্য করছে আমাকে হাঁটার ব্যাপারে। পরিবেশটাকে স্বাভাবিক রাখতে বলতে হলো ওকে ঃ ঠিক হয়ে যাবে ও।

গাড়ীতে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে ওরা সামনের সিটে উঠে বসল। ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দার উপর আমাদের দিকে তাকিয়ে। তার মনোভাব বুঝতে পারলাম না। ছেড়ে দিল গাড়ী।

গাড়ীতে কথাবার্তা আমাদের একেবারেই হলো না। হেদায়েত খান উপস্থিত রয়েছে। মিঃ কায়েসের বাড়ীর সামনে এসে নামলাম আমরা। হেদায়েত খান চলে গেল। রাহেলা গজরাতে গজরাতে নেমে এলো বারান্দা থেকে। প্রচণ্ড রেগেছে ও। অভিমান, ক্রোধ, হিংস্রতা, গোয়ার্তুমি সবগুলোই দেখা গেল তার মধ্যে। ফিরতি পথে স্রেফ ধুয়ে ফেলতে শুরু করল হাসানকে। হাসান গম্ভীর, থমথমে মুখে গাড়ী চালাতে লাগল। রাহেলা থামছে না ঃ তুমিই না রোজ অফিস থেকে ফিরে বলো, রাস্তা-ঘাটে মেয়েছেলে নিয়ে বের হওয়াটা আজকাল দুঃসাহসের মতো হয়ে উঠেছে। আর সেই তুমিই কোন্ আক্কেলে দু'লাইন লিখে রেখে আমাকে একা একটা খা খা বাড়ীতে ফেলে রেখে যেতে সাহস পেলে। কোথায় যাচ্ছ সেটা লিখতে কি হয়েছিল? এদিকে ভয়ে ভাবনায় যাচ্ছেতাই অবস্থা আমার!

হাসানের গম্ভীরতা অটুট। আসলে রাহেলাই ওকে সুযোগ করে দিয়েছে। থমথমে ভাবটা ওর রাহেলার কথা শুনে নয়। ভাবনা

চিন্তা করার জন্যে অন্য কোনোদিকে মন দেবার ওর সময় নেই। রাহেলার কথা ও শুনতেই পাচ্ছে না। মুখটা অমন করে রেখেছে, শিক্ষা দিতে পেরেছে মনে করে রাহেলা যাতে মনে মনে সন্তোষবোধ করে।

রাস্তা ভুল হবার আর কোনো আশঙ্কা ছিল না। হেদায়েত খান রাস্তা বাতলে দিয়েছে হাসানকে। মাত্র তৈরী হচ্ছে এমন একটা রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম বলে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবতঃ। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে চুপ মেরে গেল রাহেলা। বেশ অনেকক্ষণের ঠাণ্ডা, অন্তঃসারশূন্য নীরবতা। এক সময় শুধু রাহেলা নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে জানতে চাইল: অমন দুলছ কেন রহমান তুমি? শরীর খারাপ মনে হয়?

বিশ্রামহীনভাবে টো টো করে বেড়ানো ধাতে সয় না ওর।

হাসান তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল।

স্বর্গে যাবার আশা ত্যাগ করতে রাজী আছি আমি যদি তাড়াতাড়ি নিজের পরিচিত কোথাও গিয়ে পৌঁছুতে পারি। তা যেটাই হোক, হাসানের বাড়ী বা আমার। যেখানে আমি রাগ করেছি হয়ত, ক্ষেপে গেছি হয়ত, মন খারাপ করেছি হয়ত, হয়ত পিঁপড়ে, মাছি, মশা, তেলাপোকা মেরেছি—কিন্তু মানুষ খুন করি নি। বেহেশতের আশা আমি পরিত্যাগ করতে পারি, কেননা বেহেশতে যাবার কোনো সম্ভাবনা আর নেই আমার।

গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাসান বলে উঠল: দু'মিনিটের জন্যে রহমানের সাথে ওপর তালায় যাব আমি।

হাসানের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম আমি। বেড-রুমের দরজা বন্ধ করে দিল ও নিঃশব্দে। কথা বলে উঠল নাটকীয়ভাবে এবং ভূমিকা-বর্জিত ভাষায়: রাহেলা নীচে অপেক্ষা করছে, প্রথমে ওকে আমি বাড়ীতে রাখতে যাব, অন্য কিছু করার আগে। রাহেলা আমার

জীবনের অর্ধাংশ। সব কথা যখন ও জানবে তখন প্রচণ্ড আঘাত পাবে ও। মুষড়ে পড়বে। যাতে ও অন্ততঃ আর একটি রাত আরামে ঘুমুতে পারে, সেদিক তাকিয়ে, ব্যবস্থা নেব আমি। সব কথা ও জানবেই একদিন আগে বা পরে, পরে হলেই ভাল ওর জন্যে।

ফিরে যাবার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হাসান। শেষ মুহূর্তে কোনো কথা যেন মনে উদয় হয়েছে, চিন্তা করার জন্যে সময় নিল পাঁচ-সাত সেকেণ্ড। তারপর বলতে শুরু করল আবার নাটকীয়, ভূমিকাহীন ভাষায়ঃ পালিয়ে যাও···তোমার নিজের ভালোর জন্যেই, এর চেয়ে ভাল পথ আর খোলা নেই। যেদিক দু'চোখ যায় ছুটতে শুরু করো। পালিয়ে পালিয়ে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাটিয়ে দাও জীবনটা, যেখানে ইচ্ছা, যতদূর ইচ্ছা···শুধু আমার আর তোমার বোনের চোখের সামনে নিরুদ্দেশ জীবনের ইতি টানার জন্যে ফিরে এসো না। তোমাকে রেখে এখুনি চলে যাচ্ছি আমি। ফিরে এসে তোমাকে যদি দেখতে পাই তাহলে মিসেস্ কায়েস এবং মকবুল হোসেনকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করব তোমাকে। তখন আমি আর জিজ্ঞেস করব না, তুমি ওদের দু'জনকে খুন করেছ কিনা। ওদের মৃতদেহের ছবি দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলে তুমি মেঝেতে। অনেক বাস্তব, রূঢ় প্রমাণের সাথে যোগ হয়েছে পরিচ্ছন্ন একটা অনুমান। প্রত্যেকটি প্রমাণ, সন্দেহ, অনুমান তোমাকে নির্দেশ করছে।

হাসান ওর টাইয়ের নব ধরে নাড়াচাড়া করছে, যেন খুলে ফেলতে চায়, যেন ও ওর প্রতিষ্ঠিত জীবনকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে।

আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং আমি যেন ফিরে এসে তোমাকে কোথাও দেখতে না পাই। তারপর আমি আমার কর্তব্য

পালন করার জন্যে জানা সবগুলো তথ্য বাড়ীতে সাংবাদিকদেরকে ডেকে জানিয়ে দেব, তারাই জানাবে সব ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরীকে। আর, পরে, আগামীকাল সকালে, আমি আমার পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দেব কমিশনারের কাছে।

দেয়াল ঘেঁষে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আমি, দেয়াল ভেদ করে কোথাও যেন লুকিয়ে পড়বার ইচ্ছা জাগছে। পা দু'টো কাঁপছে, সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁপা গলায় অস্ফুটে বলে উঠলাম: ভয় করছে ভীষণ···

অপরাধী মাত্রই ভয় পেয়ে থাকে

হাসান উত্তর দিল যোগ করে: ···অপরাধ করার পর অবশ্য। শোনো, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমি। যা বলে গেলাম সেই মতো কাজ করো তো ভাল, তা না হলে জানোই তো··· ···।

চলে গেল হাসান দরজার হাতল ঘুরিয়ে দিয়ে। ঘৃণিত স্বরে যে আধঘণ্টা সময় আমাকে দেবার কথা ঘোষণা করে গেল হাসান তার অর্ধেকটা সময় পেরিয়ে যেতেও নড়াচড়া করলাম না আমি। আরো মিনিটখানেক পর ওয়াশ-স্টাণ্ডের সম্মুখস্থ আলোটা জেলে নিলাম। গরম জলের কলটা খুলে দিলাম তারপর। চোয়ালে ঘুষি খাবার ফলে ব্যথাটা রয়েছে এখনও, অনুভব করছি। কিন্তু ব্যথার কথা ভাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। ড্রয়ার খুলে ক্রীমের শিশি, ব্লেড আর রেজার বের করে আনলাম। ক্রীম আর রেজারটা বের করে আনলাম স্রেফ অভ্যাসের বশে। সাথে সাথেই মনে পড়ল, এতোসব লাগবে না। ক্রীমের শিশি আর রেজারটা রেখে এলাম যথাস্থানে।

গরম জল কল বেয়ে পড়ছে, বয়ে যাচ্ছে ড্রেন বেয়ে।

প্রচণ্ড হয়ে উঠল ক্ষতস্থানের ব্যথাবোধ। এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, ক্ষতটাকে আরো গভীর করার সময় নতুন করে আর

কোনো ব্যথা অনুভব করতে পারছি না। ড্রেন বেয়ে ধাবিত জল রক্তস্রোতকে নিজের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে।

হয়ত গলায় ব্লেডটা ব্যবহার করলে দ্রুততর হতো কাজটা, কিন্তু অতটুকু সাহস আমি পাচ্ছি না। প্রাচীন রোমবাসীগণ এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিল। বই-পুস্তকে পড়েছি আমি। হয়ত মন্থর গতিতে কাজ হয়, কিন্তু হয়। সম্পূর্ণভাবেই উদ্দেশ্য সাধন করে। বাঁ দিকের হাতটায়ও ক্ষতের সৃষ্টি করলাম। তারপর ফেলে দিলাম ব্লেডটা। পৃথিবীর সকল সুখ-স্বপ্ন এবং সকল দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া থেকে নিস্তার পেতে চলেছি আমি। দেরী আছে এখনও, একথা জোর করে বলা যায় না। না, কতই বা আর দেরী হতে পারে বড়জোর? এই তো, দুর্বলতা বোধ করছি আমি। হাঁা, দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসছে ক্রমশঃ।

সাত

চোখের সামনে কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠেছে, এমন সময় ওর আগমন-ধ্বনি শুনলাম দরজার বাইরে। অসম্ভব স্থির থাকার চেষ্টা করলাম আমি। যাতে ও ভাবে, আমি ওর উপদেশ গ্রহণ করেই পালিয়ে গেছি। কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা পাচ্ছি না।

ও নিশ্চয়ই শুনতে পেল, ধপ করে যে শব্দটা হলো হাঁটু ভেঙে আমার শরীরটা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার ফলে। পরক্ষণে শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠস্বর, আগের মতোই শাসালো: দরজা খোলো, তা না হলে তালায় গুলি করে ভিতরে ঢুকব!

কোনো লাভ নেই আর ঘরে ঢুকে। ও যদি ভিতরে ঢুকতে চায় তাহলে ঢুকতে পারে। অনেক দেরী করে ফেলেছে। আমার আর কোনো আশা নেই। চাবিটা কী-হোলে আগে থেকেই ঝুলছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দরজার সামনে গিয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঁচু করলাম শরীরটাকে। চাবিটা ধরে ঘুরিয়ে দিলাম ধীরে ধীরে। তারপর আমি দরজা ধরে উঠে দাঁড়ালাম আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে। দুর্বল কণ্ঠে বললাম: ঝামেলায় না জড়িয়ে ফিরে গেলেই ভাল করতে নিজের জন্যে।

ও শুধু বলল, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে, অনুশোচনাময় কণ্ঠে: এমনটি যে করে বসবে তা আমি ভাবি নি সত্য!

দ্রুত শার্ট ছিঁড়ে ফেলল হাসান ওর নিজেরই। ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিল ও ভয়ানক শক্ত করে। আমাকে নিয়ে নীচে নামল অতি কষ্টে। গাড়ীতে উঠিয়ে বসাল। তারপর ছুটিয়ে দিল গাড়ী ব্যগ্রভাবে।

হাসপাতালে আমাকে ধরে রাখল না ডাক্তাররা। ক্ষতস্থানগুলো সেলাই করল শুধু। বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেবার উপদেশ দিয়ে। আত্মহত্যা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছি আমি···সেই, সেই ঘটনার পর থেকেই নিশ্চয়। তাছাড়া সেফটি রেজারের ব্লেডগুলোর গভীরতা সৃষ্টির ক্ষমতাও অত্যল্প।

সময় ইতিমধ্যে থেমে থাকে নি। থাকে না বলেই। আমার রুমে যখন আমরা ফিরলাম তখন ভোর চারটে। কাপড় বদলাবার সময় হাসান আমার বিছানাটা ঠিক করে দিল।

গ্রেফতারের কি হলো? স্থগিত?

সাধারণ একটা প্রশ্নের মতোই প্রশ্ন করলাম আমি। ব্যঙ্গ করে নয়, বিদ্রূপ করে নয়, এমনকি কৌতূহলী হয়েও নয়।

বাতিল।

হাসান যোগ করল: বাতিল করে দিয়েছি। আমি তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা তুমি গ্রহণ কর নি। সত্যি কথাটাই বলি, রাহেলাকে একাই আমি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি গোটা সময়টা দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ওপর সদর-দরজার দিকে চোখ রেখে। কেউ যদি পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ হাতে পেয়েও বেছে নেয় নিজেকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে শেষ করে ফেলার পথ, তাহলে স্বীকার করা উচিত যে তার কাহিনীতে নিশ্চয় কিছু একটা আছে। রহমান, তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছ নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণিত করে। তোমাকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করা যেতে পারে, এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যাবার পর এটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার শিখেছি আমি। আমি জানি না, সে রাত্রির ঘটনার ব্যাখ্যা কি হতে পারে, কিন্তু আমি এখন মনে করি না, সত্যি সত্যি তুমি জান সে রাত্রে তুমি কি করেছিলে। আমার বিশ্বাস, তুমি সত্য কথাই বলতে চেষ্টা করেছ তোমার নিজস্ব জ্ঞান অনুযায়ী।

ক্লান্ত বোধ করছি আমি।

বললাম যোগ করে: বারোটা বেজে গেছে আমার মনের। এসব বিষয়ে আর কোনো কথা বলার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই আমার।

একটা বালিশ নিয়ে সোফা-সেটের উপর ফেলে হেলান দিল হাসান: আমি বরং রাত্রিটা তোমার সাথে কাটিয়ে যাই।

শক্তিহীন কণ্ঠে বললাম: চিন্তা করো না শুধু শুধু। দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা আমি করব না। আমার মনে হচ্ছে···।

আমরা কথা বলছিলাম নীচু স্বরে। সারারাত ধরে আবেগ, উত্তেজনা আমাদেরকে উন্মাদপ্রায় করে রেখেছিল। আবেগ, উত্তেজনার

ছিটে ফোঁটাও নেই এখন আমার বা হাসানের মধ্যে। আমার বিষয়ে অবশ্য অন্য এক কারণ রয়েছে, সেটা হলো প্রচুর রক্তক্ষরণ জনিত। আর এক মুহূর্তের বিলম্বে আমরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম চিরদিনের জন্যে। কোনো ভাবেই আর যোগ হতো না আমাদের দু'জনার সময়, চিন্তা, ভাব, স্থান। ব্যাপারটা যেন একটা কেমিক্যাল ফর্মুলা। একটি অণু পরিবর্তন করো, ফলাফল কোনো দিনই এক হবে না।

এই মুহূর্তগুলো একান্তভাবেই আমাদের, আমাদের সময়, আমার এবং হাসানের। আরাম করে পা ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা হয়েছে ও সোফার উপর। মেঝের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে ও। হঠাৎ কেমন যেন স্থির হয়ে গেল ওর দৃষ্টি মেঝেতে। তারপর মেঝের উপর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে আবার স্থির হয়ে রইল। মেঝেতে, অর্থাৎ ওয়াশ-স্ট্যাণ্ড থেকে দরজা পর্যন্ত রক্তের দাগ লেগে রয়েছে আমার আত্মহনন প্রচেষ্টার স্বাক্ষীস্বরূপ। সোজা একটা লাইন। আমার দিকে ফিরে হাসান মুখ খুলল: সত্যি, তুমি অদ্ভুত একটা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলে···।

গ্যাসের কথাই প্রথমে সব আত্মহত্যাকারীর মনে পড়ে, আমার ধারণা।

ধীরে ধীরে, থেমে থেমে আবার বললাম আমি: আমারও তাই হয়েছিল, কিন্তু এ বাড়ীতে গ্যাস নেই আমাদের,···সুতরাং কোনো উপায় দেখতে পাই নি তখন ব্লেড ছাড়া···।

ঘুমের আমেজে জুড়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা। হাসান বলছে, শুনতে পাচ্ছি: ভাগ্য ভাল গ্যাস ছিল না, তিতাস প্রোজেক্ট-এর ফলে আশ-পাশে তো অনেক বাড়ীতে এসে গেছে গ্যাস। গ্যাস

যত বাড়ীতে থাকবে না, আমার মনে হয় ততই কম সংখ্যক মানুষ ।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। গ্যাস কিন্তু বিশ্বস্ত। বিদ্যুতের মতো এখন আছে এখন নেই, তা নয়। হাসানকে বললাম: তা হয়ত ঠিক, কিন্তু ইলেক্‌ট্রিসিটির অসুবিধেও সহ্য করা মুশকিল। প্রায়ই ভোল্টেজ বেড়ে যায়, ফলে বারোটা বেজে যায় বাল্‌বের। এই রকম ঘটেছিল একদিন আমার পাশের রুমের বাসিন্দার মনে পড়ছে আমার, বেচারাকে মোমবাতি ব্যবহার করতে হয়েছিল···।

চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে গেছে আমার। ঘুম পাচ্ছে সত্যি, সম্ভবতঃ হাসানেরও। কিন্তু কথার পিঠে একটা কথা থাকে, সেটা না বলে থাকতে পারা যায় না কোনো কোনো সময়। তাই নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললাম, প্রায় ফিসফিস করে স্বর বের হলো: কবে, তাও মনে পড়ছে আমার, যে রাতে সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছিলাম আমি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে···।

ঘুমিয়ে পড়ছি এবার সত্যিসত্যি।

তুমি জানলে কিভাবে লোকটা মোমবাতি ব্যবহার করেছিল? তুমি সেখানে ছিলে নাকি?

হাসানের কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খুলে গেল আমার। আমার বলা শেষ কথাটা শুনে হাসানেরও চোখ খুলে গেছে অনুমান করলাম। পাশ ফিরেছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে আছে বালিশে মাথা রেখে।

বললাম না, সে আমার দরজা ঠেলে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছিল রুমের ভিতরে এক মিনিটের জন্যে, হাতে ধরা ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি। প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল আমার আলোও চলে গেছে কিনা। তার আগে বলেছিল, ওর বাল্‌ব জ্বলছে না কেন যেন। অনুমান করলাম ও জানতে চাইছে, কারেন্ট গোটা বাড়ী থেকেই চলে গেছে কিনা।

নাকি শুধু তার নিজের রুমই আলোহীন। এধরনের রুমিং হাউসের বাসিন্দারা কেমন হয় তা জানই তো···।

: কিন্তু দরজা ঠেলার কারণ কি, হল থেকে কি ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারত না?

হাসানের কণ্ঠস্বর এখন আগের মতো তন্দ্রালু মনে হচ্ছে না।

: বাড়ীওয়ালা ওপরের হলের আলো নিভিয়ে দেয় রাত এগারোটার পরে। হয়ত হল অন্ধকারময় ছিল বলে···।

হাসানের মাথা বালিশ থেকে উপরের দিকে উঠে পড়েছে। মনোযোগ দিয়ে, যেন দু'টো কানই ব্যবহার করে আমার কথা শুনতে চায় ও। আমার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল: তা সত্ত্বেও এটা কোনো কারণ নয় দরজা ঠেলে ভিতরে মাথা গলিয়ে দেবার। রহমান, ব্যাপারটার বাকী অংশটা বলো আমাকে। শুনতে চাই।

: আর কোনো বাকী অংশ নেই এর। যা বললাম তাই সব।

: তুমি তাই ভাবছ বটে। লক্ষ্য করো এর ভিতরে কত প্রশ্ন এবং উত্তর আছে। শুরুতেই বলো দেখি, লোকটা কে? কিংবা আগে কখনও দেখেছ তুমি তাকে?

বাহ্, দেখেছি বৈকি!

আমি হাসানের অতি-কৌতূহলে হেসে ফেললাম। অনেকদিন পর এই আমার প্রথম হাসি। ওকে বললাম: আমরা পরস্পর অপরিচিত নই। ওর নাম রুহুল আমিন। ঘটনাটা ঘটার এক সপ্তাহ বা দশদিন আগে থেকে বাস করছিল ও এখানে। 'কেমন আছেন?' 'এই তো ভাল, আপনি?'—এই জাতীয় কুশল প্রশ্ন করতাম পরস্পরের দেখা হয়ে গেলে। প্রায়ই দেখা হতো আমার সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময়। তাছাড়া কোনো কোনো সন্ধ্যায় গায়ে বাতাস

লাগাবার জন্যে রাস্তার মুখে দু'জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, যখন কারো কাজকর্ম হাতে থাকত না।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো, কিভাবে তুমি ঘটনাটা উল্লেখ করতে ভুল করেছিলে, সন্ধ্যার পর থেকে সে-রাত্রির প্রতিটি মিনিটের প্রতিটি ঘটনা উল্লেখ করার জন্যে হাজার বার করে প্রশ্ন করার পরও ?

: কিন্তু এই ঘটনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই 'সেটার'। স্বপ্নটা দেখেছিলাম আমি আরো পরে, লোকটা চলে যাবার পর ঘুমন্ত অবস্থায়। তুমি বার বার করে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, সন্ধ্যার পর সে-রাত্রে ঘর ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও বাইরে বেরিয়েছিলাম কিনা, এই জাতীয় প্রশ্ন। বেরুই নি, এমন কি দরজা পেরিয়ে হলে পা-ও রাখি নি আমি, এমন কি যখন রুহুল আমিন দরজায় অমনভাবে হাজির হয়েছিল তখনও নয়। আর কেউ কোনো কথা আমাকে জিজ্ঞেস করতে আসে নি, ডাকতে আসে নি, সুতরাং ঘরের ভিতর থেকে আমি যে বের হই নি সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। রুহুল আমিন যখন দরজায় এসেছিল তখন আমি রীতিমতো শুয়ে পড়েছি বিছানায়, এবং আমি বিছানা ছেড়েও উঠি নি তাকে ভিতরে ডাকার জন্যে—এখন বলো এর চেয়ে বেশী তুমি আর কি জানতে চাও ?

আচ্ছা, তুমি তাহলে সে-সময় বিছানায় শুয়ে পড়েছিলে ?

শুয়ে পড়েছিলাম আরো খানিক সময় আগে, শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলাম রোজকার মতো। কাগজ রেখে আলো নিভিয়ে দেবার কয়েক মিনিট পরই রুহুল আমিনের হালকা আঙুলের টোকা শুনি দরজার গায়ে···।

হাত নাড়ল হাসান সম্মতিসূচক ভাবে। বলল : হ্যাঁ, ঠিক

ওইভাবে সহজ সরল করে বলে যাও। ধীরে ধীরে, ভাগ ভাগ করে। যেন আমি একটা আট বছরের বাচ্চা ছেলে, তুমি আমাকে কোনো গল্প শোনাচ্ছো।

সোফা ছেড়ে উঠে এসেছে হাসান অনেক আগেই। দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আমি ভেবে ভেবে অবাক হচ্ছি শুধু, এমন একটা সাধারণ, তাৎপর্যহীন ঘটনা শোনার জন্যে এমন অস্বাভাবিকভাবে কেন ব্যগ্র হয়ে উঠেছে হাসান?

বিছানায় পাশ ফিরে সাড়া দিয়েছিলাম আমি, 'কে দরজায়?' ও উত্তর দিয়েছিল নীচু স্বরে, 'রুহুল আমিন, পাশের রুমের।'

চোখ নাচাল হাসান। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে। জিজ্ঞেস করল: নীচু-স্বরে? গোপন কণ্ঠে? রুদ্ধস্বরে?

হাসানকে নিয়ে দেখছি ভারী মুশকিলে পড়লাম। বললাম: ও হয়ত চায় নি আমাকে ডাকতে গিয়ে বাড়ীর আর সব বাসিন্দাদেরকে জাগিয়ে ফেলে। তাই ফিসফিস করে···।

হয়ত ব্যাপারটা তাই হবে। বলে যাও।

বিছানা থেকেই দরজা ছুঁতে পারি আমি, তা তো তুমি জানই। তাই করলাম, বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে কী-হোলে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম, খুলে গেল দরজা। ও দাঁড়িয়েছিল পায়জামা পরে, নিজের সামনে ধরে রেখেছিল জ্বলন্ত মোমবাতিটা। আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার রুমে কারেন্ট আছে কিনা। বেড সুইচ জ্বেলে দেখলাম। বললাম, 'ছিল, এখন নেই।'

তারপর সে কি ফিরে গিয়েছিল তক্ষুণি?

মানে, ঠিক তক্ষুণি নয়। বেড-সুইচ সেই মুহূর্তেই অফ করে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আরো কয়েক মিনিট দরজার গোড়ায়

দাঁড়িয়েছিল ও।

আলো আছে কি নেই জানতে এসেছিল, আলো নেই তো জানল, তারপরও দাঁড়িয়ে থাকার মানে কি?

ভাল কথা, মানে, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা-প্রার্থনা বা বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি করতে দাঁড়িয়েছিলো আর কি।

ঠিক কি ভাষায় বিনয় প্রকাশ করেছিলেন ভদ্রলোক?

বাব্বা, সে এক অবাক কাণ্ড বটে। লোকটা বাতিকগ্রস্ত স্কুল মাষ্টারের চেয়েও বেশী।

তোমার তো জানা আছে মানুষগুলো এরা কেমন হয়। বলল যে, সে খুব ভয়ানকভাবে দুঃখিত আমাকে বিরক্ত করার জন্যে। সে যদি জানত ইতিমধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়েছি আমি ঘুমোবার জন্যে তাহলে কোনো অবস্থাতেই বিরক্ত করতে আসতো না আমাকে! তারপর বলল, 'আপনি খুবই ক্লান্ত, তাই নাকি? হু, বুঝতে পারছি আপনি খুবই ক্লান্ত বোধ করছেন।'

: লাইট তখন অফ রুমের।

স্বগতোক্তি হাসানের, প্রশ্ন নয় কোনো।

বললাম: বেড-সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম আগেই। কিন্তু মোম-বাতিটা উজ্জ্বল হয়ে আলো ফেলছিল আমার মুখে। ও বলল—হ্যাঁ, আপনি ক্লান্ত, আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু, জানো হাসান, সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো ওর কথাগুলো শোনার আগে মোটেও ক্লান্ত বোধ করছিলাম না আমি, কিন্তু যখন ও বলতে শুরু করল 'আপনি ক্লান্ত, আপনি খুবই ক্লান্ত' তখন সত্যি সত্যি ক্লান্তি বোধ করছিলাম আমি।

পুনরাবৃত্তির মতো, তাই নাকি? ইতিমধ্যে চারবার উল্লেখ

করেছ তুমি কথাটা।

চিন্তাকুল মনে হলো হাসানকে। বললাম : সত্যি, কথাটা সে বার-বার বলছিল, চেষ্টা করলেও বলা যাবে না মোট কতবার বলেছিল কথাটা। ধীরে ধীরে বলছিল, বলেই যাচ্ছিল, আর খুব নীচুস্বরে নেমে যাচ্ছিল ওর উচ্চারণ ক্রমশঃ।

আমি কথা বলতে বলতে হাসলাম। আবার বললাম : আজব ধরনের মানুষ, এরকম হয় কেউ কেউ ; একটা কথা বারবার করে উল্লেখ করাটা এদের রোগ, নিজেকেই শোনাতে থাকে যেন একটা কথা অসংখ্যবার।

: ঠিক আছে, বলে যাও। তারপর ?

এরপর আর বলবার কি থাকবে ? দরজা বন্ধ করে চলে গেল ও, পর মুহূর্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম আমি।

এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। তুমি কি স্থির নিশ্চিত যে, ভদ্রলোকটা দরজা বন্ধ করেছিলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ? তুমি স্বচক্ষে 'দেখেছ' দরজা বন্ধ হতে ? কিংবা বন্ধ হবার শব্দ 'শুনেছ' ? নাকি, অনুভবের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাস করেছিলে যে, দরজা নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিয়েছেন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? কেননা তুমি আশা করেছিলে এটাই, অন্যকিছু আশা করার থাকতে পারে না।

হাসান সামান্য একটা ব্যাপারকে এমন ঘোলাটে করে তুলছে কেন বুঝতে পারছি না ছাই আমি : অবশ্য, অতটা মনোযোগ বা সচেতনতা সেই মুহূর্তে ছিল না আমার। বললাম না তোমাকে, ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম···!

অধৈর্যস্বরে কথাটা শেষ না করেই ওর দিক তাকিয়ে রইলাম। হাসান দরজাটা আস্তে করে খুলে ধরল, সম্পূর্ণ ভেজিয়ে দিল আবার।

ক্যাঁচক্যাঁচ করে শব্দ উঠল মৃদু।

এরকম শব্দ হয়েছিল কি?

প্রশ্ন করে অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হাসান আমার দিকে। আবার বলল: পরিষ্কার 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর দিতে পারছ না তুমি, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার। তার মানে, তুমি শব্দটা শোনো নি।

কিন্তু দরজাটা বন্ধ না হয়ে পারে না, হাসান।

বাধা দিয়ে যোগ করলাম আমি: দরজা বন্ধ না করে কি করবার ছিল ওর? সারারাত বসে থাকত নাকি আমার বিছানার পাশে পাহারা দেবার জন্যে? মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল, সুতরাং রুহুল আমিন নিশ্চয় চলে গিয়েছিল।

মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল। তোমার চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মোমবাতিটা দেখতে পাও নি, এমনও তো হতে পারে? কিভাবে তুমি জানলে যে, মোমবাতিটা অদৃশ্য হয়েছিল? তোমার চোখ বন্ধ হলে মোমবাতি কেন, গোটা পৃথিবীটাকেই অদৃশ্য বলে মনে হবে।

আমি কোনো কথা বললাম না। হাসান আবার বলল: তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল রুহুল আমিনের গলার স্বর তোমার ওপর? বিশেষ করে যখন উচ্চারণ করছিল বারবার করে 'আপনি খুবই ক্লান্ত'?

যেন, মানে, খুবই শান্তিদায়ক ধরনের। অত্যন্ত ভাল লাগছিল আমার।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল, উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে যেন: আর একটা ব্যাপার। ঠিক কোন্ জায়গাটায় ধরে রেখেছিলেন তিনি মোমবাতিটা, ওঁর শরীরের কোন্ অংশ বরাবর?

ঠিক মধ্যিখানে, ওর নিজের মুখের ঠিক মাঝখানে। তার মানে, মোমবাতির শিখাটা ছিল ঠিক ওর দুই চোখের মধ্যবর্তী জায়গায়।

আবার মাথা নাড়ল হাসান। প্রশ্ন করল: তুমি কি সোজাসুজি তাকিয়েছিলে মোমবাতির শিখার দিকে?

হ্যাঁ। চোখ ফেরাতে পারি নি আমি। অন্ধকার ঘরে এরকম আগুনের শিখা পেয়ে বসে মানুষকে একেবারে

আচ্ছা, মোমবাতিটার পেছনে, যদি তিনি মোমবাতিটা ধরে রেখে থাকেন তুমি যেমন করে বলছ, তাহলে ওঁর সাথে তোমার চোখাচোখি হয়েছিল।

ভারী মুশকিল পড়লাম। বললাম: নিশ্চয়, আমার বিশ্বাস নিশ্চয় ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। মোমবাতিটা সারাক্ষণ ধরেছিল ওর আর আমার চোখের ঠিক মধ্যবর্তী সরলরেখা বরাবর।

হাসান ঢোক গিলল বার কয়েক, যেন খাট্টা আঙুর খাচ্ছে ও। তারপর স্বগতোক্তি করল আপন মনেই, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম কথাগুলো: ···চোখ দুটো ছিল অচঞ্চল, স্থির, এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ কাঁচের মতো···স্বপ্নাচ্ছন্ন বা ভালোবাসাহীন·····লোকটাকে দেখাচ্ছিল অপকৃতিস্থের মতো···।''

কি?

প্রশ্ন করে উঠতে হাসান বলল: স্মরণ করছিলাম মিসেস্ কায়েস মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যা বলেছিলেন ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরীকে। আর একটা কথা—তুমি বলেছিলে, রুহুল আমিনের সাথে মাঝেমধ্যে রাস্তার মুখে হাওয়া খেতে যেতে, কি কি বিষয়ে কথাবার্তা চলত, মনে করতে পার?

মানে, অল্প-বিস্তর সব বিষয়ই। এই যেমন আবহাওয়া, ক্রিকেট, রাজনীতি ইত্যাদি, লোকে যেমন আলাপ করে থাকে সচরাচর। কখনো-সখনো হয়ত দু'টো-একটা ব্যক্তিগত বিষয়েও কথা হয়েছে, ভাল শ্রোতা পেলে যেমন সুখ-দুঃখের কথা বলে ফেলি আমরা।

তোমার অতীত জানার প্রচেষ্টা।

আপন মনেই বলল হাসান। তারপর আমাকে প্রশ্ন করল আবার: ওর সাথে থাকার সময় কখনও কি এমন কাজ নিজকে করতে দেখেছ যা তুমি করতে চাও নি?

না। আচ্ছা, দাঁড়াও,···হ্যাঁ। একবারে ওর পকেটে কফ-ড্রপ ছিল। ড্রপটায় আবার কর্পূরের গন্ধ। পকেট থেকে সেটা বের করে বারবার অফার দিচ্ছিল যতক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলাম আমরা। উহু, ওই গন্ধটাই সহ্য হয় না আমার! প্রত্যেকবার 'না' বলেছি ওর প্রস্তাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছিল ড্রপটা।

নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসান বলে উঠল: তোমার ইচ্ছাশক্তি কতটা দুর্বল তার পরীক্ষা নিচ্ছিল।

: মনে হচ্ছে, তুমি কিছু একটা বের করতে চাইছ সম্পূর্ণ ব্যাপারটার ভিতর থেকে।

অসহায়ভাবে যোগ করলাম আমি: কি সেটা? তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না এতটুকুও।

ভেবো না। ঠিক এখুনি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না আমি। এখন ঘুমোও তুমি, রহমান। এতোক্ষণ ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিয়েছি তোমাকে দিয়ে। ঘুমোও।

সোফা থেকে রুমালটা নিয়ে পকেটে ভরল হাসান। চলে যাবার

প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। জিজ্ঞেস করলাম : যাচ্ছ কোথায় তুমি? তুমি না বললে, রাতটা থাকবে আমার সাথে?

যেতে হচ্ছে মিঃ কায়েসের সেই বাড়ীতে। যাব ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরীর সাথেও দেখা করতে। কেসটার সাথে জড়িয়ে রয়েছি যখন, তখন ।

: কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে তুমি ছুটবে অতটা পথ পেরিয়ে সেই বাড়ীতে? সকাল হয় নি যে এখনও?

দরজা খুলে ঘুরে দাঁড়াল হাসান। বলল : একটা কথা রহমান, কি হয়েছে না হয়েছে সেসব কথা ভেবে মুষড়ে পড়ো না যেন। একটা না একটা উপায় খুঁজে পাবই আমরা। Don't take any more short-cuts.

চলে গেল হাসান আমাকে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে না দিয়ে।

আট

হাসান চলে যাবার খানিক পর ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

ঘুম ভাঙল আমার দুপুরের শেষাংশে। কিন্তু তখনও হাসান ফিরে আসে নি। ঘণ্টা দু'য়েক পরও ওর ফেরার নাম-গন্ধ নেই। কাপড়-চোপড় পরলাম। কিন্তু কোনো রকমেই বাইরে বেরুতে পারলাম না ঘর ছেড়ে। এমনকি এক কাপ চা খেতে যাব রাস্তার মোড়ে, তারও সাহস হলো না। ভয় হতে লাগল অন্যদিক দিয়ে, হাসান এসে আমাকে

না দেখতে পেয়ে যদি আবার ফিরে যায়? বলা যায় না, আমাকে না দেখতে পেয়ে ও হয়ত ভেবে বসবে, সিদ্ধান্ত বদলে সত্যিসত্যি পালিয়ে গেছি আমি শেষ পর্যন্ত।

পালাবার সুযোগটাই আসলে বড় কথা নয়। পালিয়ে কোথায় যাব আমি? পালানো কি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় শেষ পর্যন্ত?

এখন একমাত্র মাধ্যম, মুক্তি পাবার উপায়—হাসান।

বেলা চারটের দিকে এলো ও। হাত দু'টো কচলাতে কচলাতে আমাকে উত্তেজিত পদক্ষেপে পায়চারি করে বেড়াতে দেখল।

চোখের কোণে কালি জমেছে যেন ওর গতরাত এবং আজকের এতো বেলা পর্যন্ত না ঘুমোনোতে। একটা চেয়ারে হাত-পা ঢিলে করে দিয়ে বসে পড়ল ও। পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুলে ফেলল জুতো জোড়া। তারপর ঘরের বাতাসে আলোড়ন তুলে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁপ ছাড়ল।

অধৈর্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছি এতোক্ষণে, রুদ্ধকণ্ঠে জানতে চাইলাম: তখন থেকে সেখানেই ছিলে নাকি এতটা সময় ধরে?

একবার ফিরে এসেছিলাম শহরে এর মধ্যে, প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সারতে, অফিস থেকে ছুটি নিতে।

বড়সড় একটা মোড়ক সাথে করে নিয়ে এসেছে হাসান। ব্রাউন পেপারে মোড়া জিনিসটা। ওর হাতেই ধরা রয়েছে সেটা। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে মোড়কটা খুলে ফেলল ও। বাঁধানো ফটো সম্ভবত জিনিসটা। ব্যাক-সাইডটা আমার দিকে করে ধরে আছে ও। তারপর সোজা দিকটা ঘুরিয়ে ধরল বটে আমার দিকে, কিন্তু বাঁ দিকের অর্ধাংশ চাপা দিয়ে রেখেছে ওর একটা হাত। জিনিসটা বাঁধানো ফটোই। বুকের কাছে ধরে, অর্ধাংশ ঢেকে, আমার দিকে

ঘুরিয়ে দিয়েছে ও। কিন্তু কোনো কথা বলছে না ও, স্রেফ দেখছে আমাকে।

লোকটাকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হলো না আমার। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, পরিষ্কারভাবে কামানো দাড়ি-গোঁফ, উঁচু নাক, নিষ্পলক দৃষ্টি, কপালের দাগ—সবই চেনা আমার। কিন্তু নতুন ঠেকল অবশ্য কয়েকটা জিনিস। গর্বোন্নত ভাবটা আগে কোনোদিন লক্ষ্য করি নি আমি ওর মধ্যে। এমন চমৎকারভাবে ফিটফাট হালেও বড় একটা দেখি নি। অবশ্য ফটো তোলার সময় দামী স্যুট পরাটা কিছু বিচিত্র নয়। টাইও লাগিয়েছে, এটা অবশ্য কখনও পরতে দেখি নি ওকে। আর একটা জিনিস, ফটোতে ওকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে। বয়সও কম যেন, হয়ত ফটোটা অনেকদিন আগে ওঠানো হয়েছে।

আমি ঘোষণা করলাম ফটোর দিক থেকে হাসানের দিকে চোখ ফিরিয়েঃ এই-ই তো রুহুল আমিন! আমার পাশের রুমের বাসিন্দা। কোথায় পেলে তুমি···?

এ যে রুহুল আমিন তা আমি জেনেই এসেছি। কোথা থেকে পেয়েছি এটা, সে কথা জিজ্ঞেস করো না। সবই তো জানতে পারবে একসময়। রুহুল আমিন বলে একে চিনলাম কিভাবে বলো তো? তোমাদের এখানকার আর সব বাসিন্দাদেরকে ফটোটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছি। দেখলাম, তুমি চিনতে ভুল করো কিনা।

আমি জানতে চাইলামঃ কিন্তু রুহুল আমিনের পাশে আর একজনের ফটো রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, ও কে?

ওর পরিচয় এই মুহূর্তে তোমার না জানাই ভাল। এর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করো না, কেমন?

হাসানকে সত্যিসত্যি আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও

বারবার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার মুক্তির কোনো না কোনো একটা পথ আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছে। সেই পথটা যে কোনদিকে কে জানে।

হাসান নিঃসন্দেহে আমার চোখে-মুখে আশার আলো ফুটে উঠেছে লক্ষ্য করল। মাথা নেড়ে, নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে আমাকে জানিয়ে দিল ওঃ না না, কোনোভাবেই নিরপরাধী প্রমাণিত করা যাচ্ছে না তোমাকে। সে প্রশ্নই ওঠে না। জানতে চাও তুমি রহমান, আমরা কিসের পিছনে ছুটছি, একবার এবং শেষবারের জন্যে? জানাতে তোমাকে হবেই, আগে বা পরে, এবং সহ্য করে নেয়া খুব একটা সহজ হবে না তোমার পক্ষে সেটা।

কোনো খারাপ খবর আছে আমার জন্যে?

খুব খারাপ। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে এখন পর্যন্ত যে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক রহস্যময় সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছ ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তারচেয়ে অবশ্য ভাল। এটা অনেক বাস্তব, পরিচিত, এবং এমন কিছু যা মন মেনে নিতে পারে অন্ততঃ। তুমি একজন লোককে খুন করেছ সেই মঙ্গলবার রাত্রে। স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত তোমার এই আইডিয়াটার সাথে। কেননা এর ভিতরে ফাঁক-ফোকর নেই কোনো, কোনো ভুল নেই, দায়টা ঝেড়ে ফেলার উপায় নেই কোনো। ব্যাপারটা প্রমাণিত হচ্ছে শুধুমাত্র মিসেস্ কায়েস যে জবানবন্দি দিয়ে গেছেন তা থেকে উপসংহারে পৌঁছে তা নয়, যদিও তাঁর মাথায় জবানবন্দির কথাগুলো ভিত্তিহীনভাবে সৃষ্টি হয় নি তুমি জানো; কল্পনা করো তিনি এমন একজন লোকের বর্ণনা দিয়ে গেছেন যার সাথে তোমার মিল আছে হুবহু। প্রমাণিত হচ্ছে অন্যান্য ভাবেও, এবং সেগুলো এড়ানো সবরকম ভাবেই অসম্ভব।

যে আয়না ফিট করা দরজা বিশিষ্ট দেয়াল-আলমারির ভিতরে মকবুল হোসেনের লাশ পাওয়া গেছে, আঙুলের ছাপ পাবার জন্যে ছবি তোলা হয়েছে সেটার। পাওয়া গেছে আঙুলের ছাপ। ছাপগুলো তোমার হাতের আঙুলের, গোপনে আমি মিলিয়ে দেখেছি। তোমার রুম থেকে একটা পানি খাবার গ্লাস সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তাতে তোমার হাতের ছাপ ছিল। দু'টো মিলিয়ে দেখেছি—একই।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বারোটা বেজে গেছে আমার। পরিষ্কার।

ঃ তুমিই, এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নয় মিঃ কায়েসের বাড়ীতে হাজির হয়েছিলে এবং মকবুল হোসেনকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিলে, আর লাশটা ঢুকিয়ে রেখেছিলে দেয়াল-আলমারির ভিতরে।

আমার সাদা মুখ ভিজে গেছে ঘামে।

এবার শান্ত হবার চেষ্টা করো। তুমি মিসেস্ কায়েসকে হত্যা করো নি। করতে অবশ্য পারতে বটে, আমার অনুমান, কিন্তু তিনি ছুটে বের হয়ে পড়েছিলেন বাড়ী ছেড়ে প্রাণরক্ষার্থে। তুমি গাড়ী চালাতে জানো না, কিন্তু তিনি নিহত হয়েছেন কারো হাতে গাড়ী-চাপা পড়ে। গাড়ীটা মকবুল হোসেনের, কিন্তু মকবুল হোসেন মিসেস্ কায়েসকে খুন করতে পারে না স্পষ্টতঃ, কেননা তার আগেই মকবুল হোসেন নিজেই খুন হয়ে গেছে তোমার হাতে। এখন এসব থেকে বোঝা যায় অবশ্যই যে, কেউ না কেউ তোমাকে সেই বাড়ীতে 'নিয়ে' গিয়েছিল এবং অপেক্ষা করছিল নিরাপদ দূরত্বে। বিপদের জটিলতায় জড়িয়ে পড়াটা এড়িয়ে চলার মতো যথেষ্ট দূরত্বে

বটে, কিন্তু সেই সাথেই আবার যথেষ্ট কাছে ছিল সে যাতে করে তার প্ল্যান মতো কাজটা সমাধা হবার পথে কোনো ভুল বা ত্রুটি দেখা দিলে সে যেন স্বয়ং কলকাঠি নাড়তে পারে, তাছাড়া কোনো একজন ভিকটিম পালাবার চেষ্টা করলে যাতে করে সে সে-পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

দায়-মুক্তি ঘটছে না এতে করে আমার। একটা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হচ্ছে বটে আমাকে, কিন্তু অন্য একটার সম্পূর্ণ দায় ঘাড়ে চাপার সমান। কাউকে যদি জানানো হয় যে, তুমি 'একটা' খুন করেছ, আবার তাকে যদি বলা হয় যে, তুমি 'একজনকে' খুন করেছ — তাতে কিছু যায় আসে না তার। একজন যা একটাও তাই।

ধপাস করে বসে পড়লাম আমি, কাত হয়ে গেল মাথাটা। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্বর বের হলো দুর্বল: কিন্তু কেন জানতে পারি নি আমি কাজটা করার সময়? আমি করছিলাম কাজটা···?

কথা বলার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে আমার।

এই সমস্যাটা পরে ভেবে দেখব আমরা। সমস্যাটার রহস্য কোথায় আছে তা আমি অনুমান করতে পারলেও প্রমাণ করতে পারছি না ঠিক এখুনি। এখন তুমিই বল, প্রমাণ ছাড়া কোনো রহস্যের ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়? এবং কেবলমাত্র একটি উপায়ই জানা আছে আমার প্রমাণ সংগ্রহ করার মাধ্যম হিসেবে। তা হলো, সে রাত্রির ঘটনাটা পুনরায় ঘটানো। যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল প্রথমবার, সেভাবেই দ্বিতীয়বার ঘটাবার চেষ্টা করে।

ভেবে দেখছি, হাসান পাগল হয়ে যাচ্ছে—কিংবা আমি।

হাসান, তুমি কি বলতে চাও, ফিরে গিয়ে হত্যা করা হোক

আবার ওদেরকে ওরা কবরস্থ হবার পরেও ?

না। আমি যা বলছি তা হলো, মৌলিক ঘটনার সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিটা সম্ভাব্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে রেকর্ড করে নিতে হবে। অবশ্য, তারপরও, রেকর্ডটা বিশেষ অবস্থাঘটিত প্রমাণ হিসেবেই বিবেচিত হবে, কিন্তু এই পদ্ধতিতেই সবচেয়ে ভাল ফল আমরা আশা করতে পারি।

কিন্তু তুমি আমাকে নিশ্চয় বলতে চাইছ না যে···?

হাসান বলল: তোমাকে যা করতে বলব তা যথেষ্ট যুক্তি দিয়েই বলব। তোমাকে শিখিয়ে দেব সব, বুঝিয়ে দেব সব, জানিয়ে দেব সব। যা যা করতে বলব সে সবের মানে কি তাও অজানা থাকবে না তোমার। অজানা থাকলে ভুল করে বসতে পারো তুমি। আমি শুধু চাই, তুমি ঠাণ্ডা মাথায় যেমনটি বলে দেব তেমনটি করে যাবে। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে হলে শুধুমাত্র তোমাকে সুচারুভাবে, নির্ভুলভাবে কাজগুলো সারতে হবে। সবকিছু, শুরু এবং শেষটা, নির্ভর করবে এর ওপর···।

বিস্মিত হয়ে ভাবছি হাসান আমাকে কি বলতে যাচ্ছে।

এখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

হাসান দ্রুতস্বরে আবার যোগ করল: আমাদের হাতে বেশী সময় নেই।

উঠে দাঁড়াল হাসান চেয়ার ছেড়ে। আমাকেও উঠতে হলো। ওর সাথে রুম ছেড়ে নীচে এসে পৌঁছুলাম। গাড়ীতে উঠে বসবার ইঙ্গিত করাতে বাধ্য হয়ে উঠে বসতে হলো আমাকে ওর পাশে। জিজ্ঞেস করলাম দ্বিধাভরা গলায়: কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

গাড়ী তখুনি ছাড়ল না হাসান। কৌতুক ভরা চোখে আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করল: দুনিয়ার সব জায়গার মধ্যে কোন্ জায়গায় যেতে চাও তুমি রহমান, ঠিক এই মুহূর্তে?

সহজ একটা প্রশ্ন। বললাম: সব জায়গায় যেতে রাজী, শুধু এক জায়গা ছাড়া। সেটা হলো, আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আলমারিওয়ালা···।

আমি শঙ্কিত, তোমার ওপর জুলুম করতে হচ্ছে বলে। দুঃখিত, রহমান, তোমাকে সেই বাড়ী, সেই রুমেই ফিরে যেতে হচ্ছে আবার। এবং আজকের রাতটা তোমাকে কাটাতে হচ্ছে ঠিক সেই জায়গাতেই যদি তুমি তোমার অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাও একান্তভাবে। এখন তোমার মতামত কি, রাজী?

গাড়ী ছাড়ল না হাসান। প্রচুর সময় দিচ্ছে আমাকে।

আমি মাত্র চার-পাঁচ মিনিট সময় নিলাম। সিদ্ধান্ত নেবার কথা ভাবতেই গলা শুকিয়ে আসছে। শূন্য শূন্য ঠেকছে তলপেট। কিন্তু উত্তর দিয়ে দিলাম কোনোরকমে: আমি তৈরী।

নয়

আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে যথাস্থানে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে সব কথা। সব সুচারুভাবে শিখিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে হাসান।

বসে আছি আমি মেঝেতে, আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আমারির বাইরে, আপাততঃ বিশ্রাম নেবার জন্যে।

খানিকক্ষণ পর, বেশ খানিকক্ষণ পর, পদশব্দ শুনলাম আমি তার। বাড়ীটাকে ঘিরে চারপাশের নিস্তব্ধতা এবং বাড়ীটার অভ্যন্তরস্থ অটুট নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পদসঞ্চার এবং কণ্ঠ। ওরা এখনও সবাই নীচের তালায়। সবাই উপরে উঠবে কিনা জানা নেই আমার। সে কিন্তু উঠবেই, হাসানের এবং আমার যুক্তি অনুযায়ী।

বুঝতে পারছি, ওরা সবাই মিলে কতজন হবে। নীচের তালার কোনো রুমের ভিতরে ঢুকল ওরা। ফলে ওদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়ে বাজছে আমার কানে।

উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রস্তুত হয়ে নিলাম আমি। অপেক্ষা করে রইলাম আরো খানিকক্ষণ, সুষ্ঠুভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার এই তো সময়। এরপর কতক্ষণের জন্যে, কে জানে, সময় পাওয়া যাবে না। তবে খুব বেশী কষ্ট আমাকে করতে হবে বলে মনে হয় না। আমি জানি, আরো খানিক সময় হাতে আছে আমার। এতো জলদি উঠে আসবে না উপরে।

কণ্ঠস্বরগুলো কান পাতলে এখনও শোনা যাচ্ছে। সবাই কথা বলছে কেমন যেন দুর্বল, শোকাভিভূত কণ্ঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার কানে ঢুকল একজনের কণ্ঠস্বর: তুমি ভাই আমাদের সাথে তো কাটাতে পার রাতটা। এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পর একা এই নির্জন বাড়ীতে রাত না কাটানোটাই ভাল।

উত্তর শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম আমি। শুনতে পেলাম অবশেষে: না, আমি থাকতে পারব, ভাই। ধন্যবাদ। কোনো অসুবিধে হবে না আমার এখানে। কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারছি না ভাই, কেমন করে এমন ভয়ঙ্কর ওলট-পালট হয়ে গেল···!

উত্তরটা শুনে কিন্তু বিস্মিত হলাম আমি। একের পর এক বিস্ময় ধাক্কা মারতে মারতে কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে কে জানে। এ বাড়ীতে ও আসবে, হয়ত রাত কাটাতে—এই কথা আমাকে জানিয়েছিল হাসান। কিন্তু হাসান বলে নি, এই বাড়ীর সাথে ওর সম্পর্ক কি। এই তো বলল, 'কেমন করে এমন ভয়ঙ্কর ওলট-পালট হয়ে গেল···।' কিসের ওলট-পালট? মিসেস্ কায়েস নিহত হয়েছেন বলে কথাটা বলল ও, না, মকবুল হোসেনের কথা মনে করে বলল। কার সাথে সম্পর্ক ছিল ওর? হাসান কিন্তু আমাকে জানাতে পারতো, লোকটার সাথে এই বাড়ীর সম্পর্ক কি।

ওরা বোধ হয় আবার ফিরে এলো হলের মধ্যে। সম্ভবতঃ এবার সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাবে। ঠিক তাই, বিদায় নিচ্ছে সবাই, শুনতে পাচ্ছি কথাবার্তা। একজন বলে গেল: ঘুমোবার চেষ্টা করবেন, ভাই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কে কার হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকে বলুন, তবে এটা হলো অপ্রত্যাশিত, ভয়ঙ্কর ব্যাপার এই যা। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। চলি ভাই। আস্সালামু-আলায়কুম।

হল-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ হলো। একটা গাড়ী ছাড়ার আওয়াজও পেলাম। একটু পরই দ্বিতীয় আর তৃতীয় গাড়ী ছাড়ল। আর কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

বাড়ীটায় আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কিন্তু সে অল্প একটু সময়ের জন্যে। একটা পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে, সবাই চলে গেলেও একজন যায় নি। বেড-রুমে গিয়ে ঢুকল সেই পদশব্দ, বুঝতে পারছি। গ্লাসের টুংটাং শব্দ হলো খানিক পর। পানির গ্লাস হলে এমন হালকা শব্দ হবার কথা নয়। মদ? মদের

গ্লাস? তাই হবে হয়তো। তার মানে, মদ খাচ্ছে ও। তারপরই পিয়ানোর শব্দ, এলোপাথাড়ি আঘাতের ফলে খাপছাড়া ধরনের আওয়াজ উঠল, একা নিজেকে নিয়ে মৌজ করার সন্ধিক্ষণেই কেবল এরূপ ব্যাকরণহীনভাবে পিয়ানোয় আঙুলের টোকা দেওয়া সম্ভব।

সুইচ অফ করার শব্দ হলো। পরপরই দ্রুত পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে লাগল উপরপানে। এই হলো সময় নিজেকে লুকোবার। আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আলমারির ভিতর সেধিয়ে গেলাম। খুব কম জায়গা। এক ইঞ্চি জায়গাও নেই অবশিষ্ট। নাকের সামনে বড়জোর পৌনে এক ইঞ্চি জায়গা পাচ্ছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে ফাঁক করে রেখেছি দরজাটা পৌনে এক ইঞ্চির মতোই।

ক্রমাগত পদশব্দ প্রবেশ করল বেড-রুমে। শিউরে উঠল সর্বশরীর আমার অজান্তেই। -ওদিকটা আলোকিত হয়ে উঠল। জানালার খড়খড়ি খুলে ফেলা হলো একটা। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে আছি আমি। দেখতে পাচ্ছি বড় একটা স্যুটকেস। স্যুটকেসটা খুলে ফেলল ও। ভিতর থেকে বের হলো বার্মা-এয়ারলাইনস্-এর ছাপ মারা এয়ারব্যাগ একটা। ওর শুধু হাত দু'টো দেখতে পাচ্ছি আমি। দেহটা চোখে পড়ছে না। স্যুটকেস থেকে বের করছে একটার পর একটা জিনিস। প্যান্ট, শার্ট, রুমাল, পায়জামা, কাগজের ছোটো বাক্স, মদের বোতল ইত্যাদি।

ধক ধক করছে আমার বুক। আমার পেছনে, দেয়াল-আলমারির অভ্যন্তরস্থ কাঠে, শুকনো রক্ত লেগে আছে, এমন একজন মানুষের রক্ত যে খুন হয়েছে আমার হাতে, তা সে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে। রক্তটুকু শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে। আমার পিঠ কাঠের গায়ে লাগতেই বিঁধছে শুকনো রক্তের স্পর্শ, শিউরে উঠছে

আমার সর্বশরীর।

লোকটাকে হত্যা করেছি আমিই। কিন্তু এসে যায় না আজ রাতে কি ঘটে না ঘটে তার উপর, একটা খুনের দায় থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই আমার নেই। কোনো সম্ভাবনাই নেই আমার দায় ঘাড় বদল করার। হাসান আমাকে তাই বলেছে, এবং কোনো ভুল নেই ওর বলায়, বিশ্বাস করি আমি।

আমি যেখানে অবস্থান করছি তার বাইরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। সরু এক ফালি আলোর অংশ ঢুকে পড়ল ভিতরে। আমার হাতের উপর পড়েছে আলোটুকু। শিরশির করে উঠল সর্বশরীর।

ফাঁক দিয়ে ওর পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি আমি। ও কাছাকাছি সরে এসে অপর একটা দেয়াল-আলমারির দরজা খুলে ভাঙা আয়রণ সেফটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সেফটার সম্মুখাংশ ভেঙেছে, দুমড়ে গেছে অন্যান্য অংশ। নেড়ে-চেড়ে দেখে টেনে বের করল ও সেটা ভিতর থেকে। তারপর কোটের পকেট থেকে নানাপ্রকার জিনিসপত্র বের করে আপাততঃ ভরে রাখতে শুরু করল সেফের ভিতরে। টাকার বাণ্ডিল কয়েকটা, সব একশ' টাকার নোটের। সোনার হরেক রকম গহনা, তারপর প্রাইজবণ্ড বের হলো ওর পকেট থেকে। সবগুলো সেফের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখার পর বন্ধ করার কোনো উপায় না দেখে উঠিয়ে রাখল সেটা আবার আলমারির ভিতরে। সাময়িকভাবে এই নিরাপদমূলক ব্যবস্থাই চলবে, ওর মনের ভাব যেন সেইরকম, মুখ দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি আমি।

এবার ও উঠে দাঁড়াল, ফিরে যাবার জন্যে।

এই হলো সময়। বুঝতে পারছি আমি। এই সময়ের কথাই আমাকে বলে দিয়েছে হাসান। হাসানের দেয়া ওর নিজস্ব রিভলবারটা

পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিলাম আমি। যেমন করে ধরা হয় অস্ত্রটা, ডানহাতে ধরে হাতটা কোমরের একটু উপরে রেখে, কোমর থেকে ইঞ্চিখানেক তফাতে, সামনে সামান্য বাড়িয়ে ধরলাম আমি। রিভলবারটার মুখ স্বভাবতই ওর দিকে, ওর বুক লক্ষ্য করে ধরেছি। এবার একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হলাম, ফলে দরজার বাইরে চলে এলো আমার অর্ধেক শরীর।

এভাবেই, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ও ঘুরে দাঁড়াল অবশেষে আমার দিকে মুখ করে। এতোক্ষণ অন্যদিকে ফিরে ছিল ও, ফলে আমার ছায়াও লক্ষ্য করে নি ও। দেয়াল-আলমারির দরজাটা খুব সতর্কভাবে খুলে বেরিয়ে এসেছি আমি, ফলে কোনো শব্দও কানে যায় নি ওর।

ও আমাকে দেখছে কিনা সে ব্যাপারে বিস্ময়ের প্রথম দফায় সন্দিহান হয়ে উঠল। ও হয়ত ভাবছে, রহমানকে দেখছি, না রহমানের ভূতকে দেখছি! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সম্ভবতঃ বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ওর মনে। মুখ দেখে বিশ্বাস হচ্ছে আমার। কথাটা হাসান আগেই বলে দিয়েছে, হাসানের কথা ভুল প্রমাণিত হয় নি, দেখা যাচ্ছে।

ওর ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপতে লাগল গাছের পাতার মতো। ফলে নদীর পানিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিলে যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেরকম 'ভুট ভুট' শব্দ হচ্ছে এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ও বুঝি টলে পড়ে যাবে জ্ঞান হারিয়ে। হাঁটুজোড়া বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে, রীতিমতো বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে ওরা— কাঁপছে। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল ও ক্ষমতাবলে।

স্মরণে রাখতে হচ্ছে আমাকে হাজারো কথা। হাসান আমাকে

শিখিয়ে দিয়েছে ঠিক কি কি কথা বলতে হবে, আর কি কি কথা বলতে হবে না। সব শিখে নিয়েছি আমি আমার সম্পূর্ণ মানসিক শক্তি এবং মেধা ব্যয় করে। সব সময় সচেতন থাকছি। সময়ের ব্যাপারটাও ভুলে যাই নি আমি। ভুলে গেলে চলবে না। সময়ের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাসান আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, যে সব কথা বলতে হবে, এবং কোনো কথা বাদ দেয়া চলবে না তার মধ্যে থেকে, 'সেসব বলতে সময় পাবে তুমি খুবই অল্প।' অল্প সময়ের মধ্যেই সারতে হবে। কাজটা সারতে হবে আমাকে উপমা অনুযায়ী, সরু তামার তারের উপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং পা হড়কে বা ভারসাম্য হারিয়ে যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারি নীচের অন্তঃহীন শূন্যে। কিন্তু বিপদটা আসলে কেমন হতে পারে তা আমাকে হাসান বুঝিয়ে বলে নি। শুধু সাবধান করে দিয়েছে যে, আমরা দু'জন—আমি এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে কম্পনরত এই লোকটা, দু'জনাই হাঁটছি সরু দড়ির উপর দিয়ে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কোনো রকম সাহায্য আমরা পাব না। সব কিছুই নির্ভর করছে আমাদের দু'জনার মধ্যে, প্রথম কে ভুল করে পা ফেলবে।

লোকটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক কথা ঝালাই করে নিচ্ছি আমি। লোকটাকে বলতে হবে সব। লোকটা, ওর প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না এখন পর্যন্ত, এই বাড়ীর সাথে ওর সম্পর্কের সূত্রও অজানা আমার, যদিও অনুমান করছি একটা সম্পর্কের কথা, কিন্তু হাসান আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। না বলার কারণ হিসেবে বলেছে, তোমাকে এই মুহূর্তে না বলার যুক্তিসঙ্গত কোনো বাধা নেই, কিন্তু আমার মন বলছে তোমাকে ওর প্রকৃত পরিচয় পরে জানালেই ভাল হবে। হাসানের কথা মেনে নিয়েছি আমি।

ওর সব কথাই মেনে নিয়েছি আমি। লোকটার অবশ্য একটা পরিচয় আমার জানা আছে। খুব ভাল করেই জানি। কিন্তু সেটা নাকি ওর আসল পরিচয় নয়, হাসান বলেছে।

আমি যে পরিচয়টা জানি সেটা হাসানও জানে। এই লোকটাই রুহুল আমিন। এই লোকটাই আমাদের রুমিং হাউসের বাসিন্দা ছিল, আমার পাশের রুমে। এই রুহুল আমিনই মোমবাতি নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল আমার রুমের কারেন্ট আছে না চলে গেছে, যে-রাত্রে সেই, সেই ঘটনাটা ঘটেছিল। হাসানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই লোকটাই নাকি আমার অস্তিত্ব অকস্মাৎ বিপন্ন করে তুলেছে। আমার জীবনের চারপাশে সৃষ্টি করেছে কালো মেঘের অশুভ পাঁয়তারা।

হাসানের প্রথম আদেশ হলো, ওকে দিয়ে কথা বলাতে হবে সবচেয়ে আগে। যদি তাতে করে সারারাত অতিবাহিত হয়ে যায়—যাবে। অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না ও প্রথম কথা বলে। এরমধ্যে নিশ্চয় কোনো না কোনো তাৎপর্য আছে, কিন্তু আমার একক চিন্তায় সে তাৎপর্যের ব্যাখ্যা নেই কোনো।

ও কথা বলল অবশেষে। বলতে একজনকে না একজনকে হতোই, কিন্তু আমি বলতামই না।

কিভাবে 'তুমি' এসেছ এখানে?

ব্যাঙের কোঁকানির মতো স্বর ওর, বিকৃত।

তুমিই তো রাস্তা চিনিয়েছ আমাকে, নয় কি?

ঠোঁট জোড়াকে স্থির করার প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে ও। বেসুরো গলায় বলল আবার আমার কথা শুনে: তুমি তাহলে···তুমি তাহলে স্মরণ করতে পার এখানে আসার কথাটা!

তুমি ভেবেছিলে, স্মরণ করতে পারব না রাস্তাটা, তাই না?

চোখ জোড়া ঘুরতে লাগল ওর বিস্ফারিত দুই পাঁপড়ির ওপারে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর মন, নিশ্চয়ই। বলে উঠল: পার না···তুমি পার না সে-কথা স্মরণ করতে!

ওর গলার স্বরে অবিশ্বাস। আমি এবং আমার রিভলবার, নড়লাম না আমরা কেউই। বললাম: তাহলে কিভাবে আবার আমি এখানে ফিরে এলাম? তুমিই বল?

বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো আতঙ্কের প্রবাহ ওর আপাদ-মস্তক চলাচল করছে। দেখলাম, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি সেই দেয়াল-আলমারির দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে আছে ও। বাঁ হাতটা আমার পেছনে চলে গেল। ঠেলা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম আয়না ফিট করা দরজাটা।

কতক্ষণ ধরে তুমি এখানে রয়েছ এভাবে?

বললাম: অন্ধকার নামার কিছু আগে থেকে।

নতুন করে পুরনো প্রশ্ন আবার করল ও: কে তোমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে এখানে?

এই রিভলবারটা।

রিভলবারটা চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম ওকে। এবার ও যে প্রশ্নটা করল সেটা নাকি না করে কোনো উপায় থাকতে পারে না, হাসান আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছে আমাকে। যদি জিজ্ঞেস না করে তাহলে ও নাকি মর্তের মানুষই নয়।

: ঠিক কি কি, কোন্ কোন্ ঘটনা স্মরণ করতে পার তুমি?

সর্বজ্ঞানী ধরনের একটু হাসি দিলাম ওকে। সব বুঝল ও কথার বদলে এই হাসি দেখেই। হাসিটা অবশ্য ধার করা, আমার নয়।

হাসানের মুখের হাসি, কিন্তু পরিবেশন করলাম আমার ঠোঁট জোড়ার মিলিত ব্যবস্থাপনায়।

তোমার মনে আছে গাড়ী করে আসার কথা?

নীচু, ফ্যাসফেসে গলায় উচ্চারণ করল ও, কিন্তু গলায় এখনও সন্দেহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম নয়। যোগ করল অধিকতর দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে: সম্ভব নয়। কিভাবে সম্ভব হবে! তোমার চোখের দৃষ্টি, সেই নিয়মমাফিক টিপিক্যাল দৃষ্টি···!

: কেমন দৃষ্টি?

চুপ করে থাকল ও। ফিরে পাচ্ছে ও ওর মানসিক ভারসাম্য। হাসানের শেখানো বুলি আওড়ালাম আমি আবার: সারা রাস্তা আমি একটা পেরেক হাতের চেটোয় বিঁধিয়ে এসেছিলাম।

: তাহলে কেন তুমি সব কাজ করলে যা যা বললাম আমি···যা যা বলা হয়েছিল তোমাকে, নিখুঁতভাবে?

: আমি জানতে চেয়েছিলাম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে থামে। ভেবেছিলাম, ব্যাপারটার মধ্যে হয়ত নিশ্চয়ই কোনো রকম ভাল আছে পরে আমার জন্যে।

তুমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিনয় করেছিলে সম্মোহিতের মতো? মানে সম্মোহিত হও নি? বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! তুমি মুহূর্তের জন্যেও চঞ্চল হও নি, একবারের জন্যেও পালাতে চেষ্টা কর নি যখন গাড়ী থেকে নামিয়ে তোমার হাতে ছোরাটা দিলাম, যখন বাড়ীটার দিকে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম কিভাবে ঢুকতে হবে ভিতরে এবং কি করতে হবে! তুমি বলতে চাইছ, বাড়ীর ভিতর ঢুকে তুমি সচেতনভাবে, সজ্ঞানে···?

বাড়ীতে ঢুকে কাজটা করেছি আমি তাতে সন্দেহ কোথায়?

করেছি, কেননা আমি মনে করেছিলাম পরে তোমার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করতে পারব, তুমি আমার মুখ বন্ধ করে রাখার জন্যে টাকাটা দিতে বাধ্য হবে। তাছাড়া এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম যে, তোমার 'আদেশ' পালন না করে কোনো উপায় ছিল না। হয়ত ছোরাটা বিদ্ধ হতো আমারই পিঠে কাজ সমাধা না করে ফেরার চেষ্টা করলে, অবশ্য ভুলটা আমারই।

কি ঘটেছিল, ভিতরে কি গোলমাল হয়েছিল?

অ্যাক্সিডেন্টলি ছোরাটা নীচের তলার অন্ধকার হলে পড়ে যায় আমার হাত থেকে, সেটা আবার খুঁজে না পেয়ে খালি হাতে উপরে যেতে যেতে ভাবি, শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে বাড়ীর পিছনের পথ দিয়ে ভাগিয়ে দেব ওদেরকে, তারপর নিজেকে বাঁচাবার সুযোগ নেব একটা। কিন্তু মকবুল হোসেন তেড়ে এলো আমার দিকে, পেড়েও ফেলল আমাকে সাথে সাথে। আমার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাবান ও, খুন করে ফেলতে বাকী ছিল বড়জোর কয়েক মিনিট। সামান্য একটু দেরী হলেই ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল আমার ওর হাতে। শুধুমাত্র আমার হায়াতগুণে এবং মিসেস্ কায়েসের ভুলক্রমে কুড়ুলটা চলে এলো আমার হাতে মকবুল হোসেনের বদলে। আত্মরক্ষার্থে ঘা মারলাম ওকে কুড়ুলটা দিয়ে।

লোকটা এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন কোনো একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল ওর। বলল: ওহ, ছোরার বদলে কুড়ুলটা কেন ব্যবহার হলো বুঝতে পারলাম এতক্ষণে, ব্যাপারটা তাহলে এইরকম! তাছাড়া ভাবছিলাম, একজন আবার তোমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে কিভাবে। ভাগ্য ভাল মকবুলের গাড়ীতে আগে থেকেই বসেছিলাম আমি, তা না হলে গোলমাল হয়ে যেত সব।

আমি কি হত্যাকারী

ও ড্রাইভিং জানত না বলেই গাড়ীর দিকে ছুটে আসে নি। বাড়ী থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল ও চীৎকার করতে করতে। গাড়ীর ভিতরে বসেছিলাম, দেখতে পায় নি তাই আমাকে। গাড়ীটা যখন ওর পিছনে ছুটিয়ে দিয়েছি তখনও পিছন ফিরে তাকায় নি ও। ভেবেছিল, তুমিই নীচে নেমে গাড়ী নিয়ে অনুসরণ করছ ওকে। ধাক্কা মারল কে, তা জানতেই পারে নি। সময়মতো যদি ওকে গাড়ী-চাপা দিতে না পারতাম তাহলে সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতো। কিন্তু, কি বোকা আমি! আমার বোঝা উচিত ছিল যে, তুমি আমার ক্ষমতার আয়ত্তাধীন না হয়েই ।

হাসানের কথানুযায়ী, দড়ির উপর থেকে পা ফসকে অনেক আগেই পড়ে গেছে লোকটা। অনেক কথা, গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বীকার করে ফেলেছে ও। বলা যায়, বাধ্য হয়েছে স্বীকার করতে। কিন্তু আমি এখন হাঁটছি সরু দড়ির উপর দিয়েই, বলা যায়, কেন এবং কোন্‌দিকে তা না জেনেই। বললাম যথাক্রমে : তোমার যথেষ্ট আয়ত্তাধীনে ছিলাম আমি, ঘাবড়িও না নিজের ক্ষমতা কাজে লাগে নি মনে করে। তোমার কৌশল, নৈপুণ্য হারাও নি তুমি!

কিন্তু এই তুমি বললে···

এবং তুমি বোকার মতো বিশ্বাস করেছ তা। আমি আসলে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানি না কি করেছিলাম যখন তুমি আমাকে সাথে নিয়ে গাড়ীতে করে এখানে পৌঁছে দিয়েছিলে। পৌঁছে দিয়ে যখন এই রুমে পাঠিয়েছিলে তখনকার কাজগুলোও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, অচেতন মনে করেছি। মনে রেখ, তুমি আমার পাশের রুমে থাকতে, এবং তোমার রুমে দু'-একবার ঢুকেছি আমি।

চুপ করে গেলাম আমি। হাসান এই জায়গায় চুপ করে যেতে

বলেছিল আমাকে লোকটাকে দিয়ে এখানে স্বইচ্ছায় স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে, ওর ঘরে কখনও ঢুকি নি আমি। মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম। ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। মনের অবস্থা সেরকম নয় এখন ওর।

তাতে কি হলো?

প্রশ্ন করল ও। বললাম: ফটো দেখেছিলাম আমি।

কার ফটো বললাম না।

ফটো দেখেছিলে! কিন্তু সে তো আমার স্যুটকেসে ছিল। তোমার সামনে কোনোদিন স্যুটকেস খুলি নি তো আমি!

বললাম: তুমি একদিন স্যুটকেস খুলছিলে পিছন ফিরে, মন ছিল কোন্‌দিকে কে জানে, স্যুটকেসের দিকে তাকিয়েছিলে তুমি গভীরভাবে, লক্ষ্য কর নি তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। স্যুটকেসের ফটো দেখে ফেলেছিলাম আমি।

স্যুটকেসে ফটো ছিল একথা লোকটা স্বীকার করল বলেই মিথ্যে কথাটা বানিয়ে বলতে পারলাম আমি। হাসানের নির্দেশ।

তুমি তাহলে আমাদের দু'জনার ফটো একসাথে দেখেছিলে? কিন্তু কোনোদিন জানতে চাও নি তো আমার সাথে ওর সম্পর্ক কি?

কাজ হচ্ছে। বললাম: ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে জিজ্ঞেস করি নি। তোমার পিছনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলাম আমি, তুমি কি মনে করবে ভেবে ফিরে এসেছিলাম নিঃশব্দে, টের পাও নি।

তুমি তাহলে জান, ওর সাথে আমার সম্পর্ক কি?

না। তা কি করে জানব? কিন্তু স্মরণ ছিল তোমার সাথে, একসাথে দেখা মহিলার ফটোর চেহারাটা। কি সম্পর্ক ছিল ওর সাথে তোমার?

লোকটা একমুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর বলে উঠল: যা বলছিলে সেটা শেষ করো।

আমি শুরু করলাম: ফটোটা আমার স্মরণে ছিল। যাকগে, যা বলছিলাম। সে-রাত্রের ঘটনাটার খুঁটিনাটি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমি। যতটুকু জানতাম, সকাল বেলা উঠে ভাবলাম, দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু না। কিন্তু খবরের কাগজে বের হলো খুনের খবরটা। কুড়ুল দিয়ে হত্যার খবরটা ছিল, আয়না ফিট করা দরজাবিশিষ্ট দেয়াল-আলমারির কথাও ছিল। এসব কথা স্মরণে ছিল আমার দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে। মিসেস্ কায়েসের মুখের চেহারাও স্মরণে ছিল। কাগজে দেখলাম ছবি উঠেছে তার। মনে পড়ে গেল, তোমার ফটোর সাথে মিসেস্ কায়েসেরও ফটো দেখেছি আমি। এর আগে কথাটা মনে পড়ে নি আমার, যদিও উচিত ছিল। যাই হোক, সন্দেহ হলো, অবশ্য কোনো ভিত্তি খুঁজে পাই নি সন্দেহের যে, তুমি প্রত্যক্ষ-ভাবে এর সাথে জড়িত।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে যে, আজ রাতে আমি আসব এখানে? একটু আগে বলেছ যে, ওর সাথে আমার সম্পর্ক কি তা তুমি জান না।

: জানি না, তা ঠিক। কিন্তু একটা সম্পর্কের কথা আন্দাজ করে নেয়া অসম্ভব নয়। তবে ভুল করছ তুমি, সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ হলেও কিছু যায় আসে না। আজই তুমি এখানে আসবে তা অবশ্য জানতাম না। আসলে, প্রতিদিন সময় পেলে এখানে এসে লুকিয়ে থাকি আমি। কেন যেন আমার ধারণা হয়েছিল, তোমার সাথে মিসেস্ কায়েসের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তুমি এখানে একবার না একবার আসবেই। সুতরাং তোমার দেখা পেতে হলে এখানে লুকিয়ে

থেকে দিন গোণা ছাড়া আর কি করার ছিল আমার, বল? তোমার দেখা শেষপর্যন্ত আমি পেয়েছি। এবং আমার সন্দেহও বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিজের মুখেই তুমি স্বীকার করে ফেলেছ তোমার অপরাধের কথা। আমি ঠিক করে ফেলেছি কি করব তোমাকে নিয়ে। টাকা-পয়সার লোভ এই মুহূর্তে নেই আমার। আর তোমার যা টাকা আছে তাতে আমার মন ভরবেও না। তুমি হয়ত দুর্বল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছ আমাকে, কিন্তু সেই সাথে আমি যে চরমপন্থী লোক তা তোমার জানা ছিল না। আমি একজন নিরপরাধী, সৎ মানুষ ছিলাম। তুমি আমাকে দিয়ে, আমার অজ্ঞাতে, মানুষ খুন করিয়েছ। আইনের চোখে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারব না কোনাদিন। এর জন্যে তোমাকে মূল্য দিতে হবে। এইভাবে···!

দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, গুলি করো না···ওতে কোনো লাভ হবে না কিন্তু তোমার। আমি বেঁচে থাকলে হয়ত তোমার জন্যে কিছু করতে পারি, সুতরাং আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা তোমার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী। আমি তোমাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দিতে পারি। দেশত্যাগ করার জন্যেও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কেউ জানবে না।

জানবে। আমার বিবেক চিরকাল ধরে জানবে। এখন আমার শরীরটা একটা হত্যাকারীর শরীর, কিন্তু মনটা এখনও বিবেকসম্পন্ন মন। দোষটা তোমার, অপরাধটা তোমার, পাপটা তোমার। তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। এবার। গুলি করছি···।

এদিকে দেখ,···এই যে, এই দিকে তাকাও···।

প্রার্থনা করে চলল লোকটা: এদিকে দেখো। মাত্র এক মিনিট আর। দেখো···কাঁটা দু'টো দশের অঙ্কে। তাকাও, এই যে এদিকে,

এই দিকে···সেকেণ্ডের কাঁটাটা আবার এই দশে না আসা পর্যন্ত তাকাও···এই যে··· ।

আমি দেখতে পাচ্ছি, ও কি যেন করার চেষ্টা পাচ্ছে। হাসান এ ব্যাপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছে আমাকে। তাড়াতাড়ি ওর মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম মেঝের দিকে, ওর পায়ের সামনে রিভলবারটা তেমনি ভাবেই ধরে আছি। ওর একটা হাত নড়ে উঠতে বাধ্য হয়ে তাকালাম সেদিকে। হাত-ঘড়ি ছাড়া একটা পকেট ঘড়িও ওর সাথে রয়েছে। সেটা পকেট থেকে বের করে আমার দিকে নীচু করে ধরল ও। আবার সেই কথা : মাত্র কয়েক সেকেণ্ড···দেখো না, দেখো তুমি, এই দিকে দেখো··· ।

রিভলবারের ট্রিগারটায় গোলমাল হয়েছে কোনো, নড়ছে না কেন। আঙুল দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে টানার চেষ্টা তো করছি, কিন্তু আসছে, পিছুচ্ছে না। কিংবা হয়ত দোষ আমার আঙুলের, আঙুলটা বোধ হয় আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে না, আমার আদেশ পালন করছে না।

ঘড়ির ডায়ালে বৈদ্যুতিক উজ্জ্বল আলো পড়ে প্রতিফলন ঘটছে। প্রতিফলিত আলো আবার চোখ জোড়া ঠোকরাচ্ছে। চোখ কুঁচকে থাকছি আমি, বারবার প্রতিফলিত আলোটা চোখে পড়ছে, সরে যাচ্ছে, আবার পড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে, আবার··· । এমন বাধাতা-মূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোটা ব্যাপারটা যে ওদিকে না তাকিয়ে নিস্তার নেই আমার।

ধীরে ধীরে উপর পানে তুলে ধরল ও ঘড়িটা। ছোট্ট একটা শব্দ হলো, যেন দম দেয়ার গোল চাকাটা ধরে দ্রুত এবং গোপনে টানল ও। অবাধ্য হবার আর কোনো ক্ষমতা থাকছে না আমার। উপরে ধরে

আছে ঘড়িটা, যেমন করে সেই রাত্রে মোমবাতিটা ধরে রেখেছিল ও, যেন নির্বাধায় ডায়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে না হয় আমার। আমি ওর চোখের উপর দৃষ্টি রাখলাম। এবং অকস্মাৎ আমার দৃষ্টি অপলক হয়ে গেল। এক ধরনের আরামপ্রদ নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা পেয়ে বসল আমাকে। যেন নরম খানিকটা মোম আমি, বা যেন সাবানের ফেনা আমার সর্বশরীর, বা যেন মাখনের মতো নরম হয়ে গেছি আমি। আমার যেন আর কিছুই নেই; অতীত না, বর্তমান না, ভবিষ্যতও না। আমি যেন কি! আমার যেন কোনো ইচ্ছা নেই, কামনা নেই, রাগ নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। যেন শরীর নেই, মন নেই। যেন আমি নেই, যেন কেউ নেই, পৃথিবী নেই···। কিন্তু আমি নেই, এরকম একটা উপলব্ধি হলেও আমি যেন আছিও। কিছু নেই, তবু যেন সব আছে। এখন আমি আর আমার নই। সকলের, যার ইচ্ছা তার আমি। সবাই চালাতে পারে আমাকে, সবাই ফেরাতে পারে, নাড়াতে পারে।

আমার কণ্ঠস্বর যতটুকু সময় ধরে বের হচ্ছে তার চেয়েও বেশীক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছে: আমি তোমাকে গুলি করব এবার।

না।

লোকটা মোলায়েম করে বলছে আবার: তুমি ক্লান্ত, তুমি কাউকে গুলি করতে চাও না। তুমি খুবই ক্লান্ত, হ্যাঁ, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, রিভলবারটা সে তুলনায় খুব বেশী ভারী। একটা ভারী জিনিস কেন তুমি ধরে রাখতে চাইছ!

রিভলবারটা পড়ে যাবার শব্দ বহুদূর থেকে এসে আমার কানে বাজল। শুনতে পেলাম। যেন এই রুম ছাড়িয়ে, এই বাড়ী ছাড়িয়ে বহুদূরের একটা শব্দ শুনতে পেলাম। বড্ড অলসতা জাগছে আমার,

উফ্। আলো চলে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রমশঃ, যেন আলোটাও খুব ক্লান্ত। গোটা দুনিয়াটাকেই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। কে যেন পড়াচ্ছেঃ তুমি ক্লান্ত, খুব্ই ক্লান্ত তুমি···হারামজাদা, এবার তোমাকে পেয়েছি।

[সম্মোহনের প্রভাবে চিন্তাশক্তির বিরতি]

শুভ্র আলোকচ্ছটা যেন আমার মাথার ভিতর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যন্ত্রণা, আঘাত পাচ্ছি রীতিমতো। কি যেন, ঠাণ্ডা এবং ভিজে আমার চোখের পাতায় চাপ দিচ্ছে, যখন আমি প্রাণপণে পাপড়ি দু'টো মেলতে চেষ্টা করছি।

যখন চোখের পাপড়ি মেললাম আমি, ঘুম ভাঙার পরমুহূর্তে আলোয় যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায় তেমন না হয়ে ঠিক বিপরীতভাবে গোটা পৃথিবীটা আমার সামনে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দেখা দিল। যন্ত্রণা-বোধ ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠল। নাড়া দিচ্ছে মাথা থেকে লাংস্ পর্যন্ত। তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে যেন ফালাফালা করে কাটা হচ্ছে মধ্যবর্তী পথটুকু। আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। শ্বাস নিতে পারছি না।

চোখের বলটা ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। মাথাটা ফেটে যাবে বলে সন্দেহ করছি। প্রচণ্ড আঘাত হানছে অন্ধকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলো আমার উপর। বুঝতে পারছি, পানির অতল তলে ডুবে যাচ্ছি ক্রমশঃ। সাঁতার কাটতে পারব মনে হচ্ছে, কিন্তু কাটছি না। আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো একটা বাধা আমাকে উঠতে দিচ্ছে না।

দু'বার পাশ ফিরলাম পরপর। অন্ধের মতো পা দু'টো ছুঁড়লাম। আমার চারদিকের আবছা, অস্পষ্ট পরিবেশটাকে তাড়াতে চাই আমি।

একটা আকৃতিহীন অন্ধকারময় জড়পিণ্ড কোথা থেকে যেন হাজির হলো। ধাক্কা দিল মৃদুভাবে আমাকে। আবার সরে গেল আমি সেটাকে আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করবার আগেই। খুব পরিষ্কার-ভাবে সেটাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে পানির মধ্যে কোনো গোলমেলে বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল।

আমার ত্বকের ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। জড়পিণ্ডটা রূপান্তরিত হয়েছে ইতিমধ্যে কেবল একটা ছায়ায়। অপেক্ষাকৃত কাছে সরে এলো সেটা। যেন ঝুলছে ওটা। দুলছে আমার পাশে।

বুঝতে পারছি একটা হাত আমার ঘাড় ধরে আছে। তারপর একটা ছোরা এসে ঠেকল আমার তলপেটের কাছে। ফেরত নেয়া হলো ছোরাটা আবার। দড়ির বাঁধনে বাঁধা হয়েছে যেন আমাকে, অনুভব করা যাচ্ছে।

নিজেকে অনুভব করা ছাড়া আমার মগজের আর সব কাজ এখন স্থগিত। আমাকে পানির নীচে যথেচ্ছভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে।

আমার কপালে কোথাকার একটা বড় পাথরের স্পর্শ পেলাম। পাথরটা ছুঁড়ে মারা হয় নি, আমিই গিয়ে ধাক্কা মেরেছি পাথরটাকে। উপরপানে দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বল তারার সমাবেশ। ভিজে গেছি আমি, ভিজে গেছে কাপড়-চোপড় স্যাঁতসেঁতে ঠেকছে। মুখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে গলগল করে কে যেন আমার পাশে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, চাপড় মারছে, নাড়া দিচ্ছে। কে যেন আমার হাত-পা ধরে ঘন ঘন উপরে তুলছে আর নামাচ্ছে, উপরে তুলছে আর নামাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কাশলাম আমি। এবং কে যেন বলে উঠল:

ঠিক হয়ে যাবেন, এই তো ভাল হয়ে আসছেন উনি।

কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল ও, ওকে চিনতে পারছি আমি। হ্যাঁ, পরিষ্কারভাবে চিনতে পারছি। হাসান। ওর পরনে শার্ট নেই। শুধু একটা আণ্ডারওয়্যার।

এক মিনিট পর ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনেও কেবল আণ্ডারওয়্যার। বলে উঠলেন: চলুন, এবার ওকে নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা করি। কফি ছাড়া বাঁচব না আর একদণ্ড।

আমাদের পিছনের কোনো জায়গা থেকে আলো আসছিল। সামনে নদী। পাশেই একটা গাছ। দেখতে পাচ্ছি গাছের পাশে জড়ো করা আমার শার্ট, প্যান্ট, জুতো। শার্টের উপর একটা কাগজ। সাদা, ধবধবে সাদা কাগজ।

হাসান কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল:

"আমি মিঃ কায়েসের বাড়ীতে সংঘটিত দু'টি মানুষ হত্যার দায়ে দায়ী। খুন করার দরকার ছিল ওদেরকে। পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবেই আগে বা পরে। তাই আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না আমি।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান।"

লেখাটা আমার নিজের হাতের। উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

হাসান ইন্সপেক্টরকে বলল: এটা কি দরকার আমাদের?

চিন্তিতভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন গাউস চৌধুরী। বললেন: নষ্ট করে ফেলাই ভাল। বিচারকমণ্ডলীর কেউ কেউ অতি-মনোযোগিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, ন্যায় বিচারের ভার বহন করতে অসুবিধেয়

পড়েছেন মনে করে ভুগতে পারেন তাঁরা। পুড়িয়ে ফেলুন।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলল হাসান কাগজটা।

এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। কষ্টগুলো দূর হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে কাঁপছি নিজের অজ্ঞাতে আমি পিছন দিকে তাকিয়ে লালচে আলোর উৎসের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলাম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে: কি ওটা?

লোকটার গাড়ী। তুমি যাকে রুহুল আমিন বলে জানো তার। আমরা পিছু পিছু এসে পড়াতে বেপরোয়াভাবে গাড়ী ঘুরিয়ে ভাগতে চেয়েছিল অন্য পথে, উল্টে গিয়ে আগুন ধরে গেছে।

দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলাম আমি। হাসি বের হলো না, কেবল বিকৃত দেখাল মুখ-ভঙ্গিটা, অনুমান করলাম।

গুলি ওকে আমিই করেছি প্রথম।

ইন্সপেক্টর বললেন। হাসানের বক্তব্যও শুনলাম: আমরা তিনজনই একসাথে গুলি করেছিলাম। কার গুলিটা যে আগে লেগেছে বলা মুশকিল। জানাও যাবে না কোনোদিন। দরকারও নেই। আমি আর হেদায়েত খান পানিতে নেমেছিলাম। তোমার রুহুল আমিনকে গুলি না করে উপায় ছিল না কোনো সময় মতো হিপনোসিস্ ভাঙাবার জন্যে ওকে আক্রমণ না করলে কি যে হতো খোদা মালুম। তুমি তো 'নিজের' ইচ্ছায়ই ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছিলে। লোকটার দিকে রিভলবার ধরে তোমার ওপর থেকে তার প্রভাব প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে হুকুম করা যেত, কিন্তু তাতে দেরী হয়ে যেত অনেক। তোমার অবস্থান জানার পর চোখের সামনে নোঙরের দড়ি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই নি আমরা। নৌকো তো পরে পাওয়া গিয়েছিল।

একটা ছায়ামূর্তি আমাদের দিকে হেঁটে আসছিল লালচে আলোর

দিক থেকে। হেদা য়ত পান। সামনে এসে বলল: কোনোই উপায় নেই। সব ছাই হয়ে গেছে।

ফিরে যাওয়া যাক বাড়ীটায়।

হাসান বলল।

ফিরে এলাম আমরা। যেখানে ফিরে এলাম সেখান থেকেই গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু কিভাবে গিয়েছিলাম, যাবার কথা বিন্দু-বিসর্গ কিছুই মনে নেই আমার। ফিরলাম আমরা চারজন। ফেরার কথা ভুলব না, মনে থাকবে।

আমাকে ওরা ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল। ওরাও কাটাল রাতটা ওখানে। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, এতোসব অপরাধের হোতা যে, যে দায়ী, যে আমার জীবনের সবচেয়ে ভীষণতম এবং সর্বনেশে শত্রু, তার বিছানাতেই রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলাম আমি।

ভোরবেলা হাসান আমার কাছে উঠে এসে বসল। অন্য দু'জনের ঘুম ভাঙে নি তখনও খানিক পরে ওর সাথে কোথায় যেতে হবে আমাকে তা আমার জানা আছে ভাল করেই। কিন্তু খুব বেশী ভয়-ভাবনা নেই সে জন্যে আর।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম: কোনো উপকারে আসবে নাকি গতরাতে যা যা করেছি আমি? সাহায্য করবে আমাকে?

: নিশ্চয়।

হাসান যোগ করে বলে যেতে লাগল: এই তো চেয়েছিলাম আমি। গতকালকে অতোটা সময় ধরে এখানে এসে কি করেছিলাম বলে মনে করো তুমি? তোমাকে বারবার করে নির্দেশ দিয়েছিলাম কেন লোকটাকে কথা বলাবে আট দেয়াল-আলমারিবিশিষ্ট রুমের ভিতরেই, বাইরে কোথাও নয়? সব ব্যবস্থা সেই অনুযায়ী করেছিলাম আমি,

ফলে তোমাদের সবটুকু আলাপ-আলোচনা লিখে নিতে পেরেছি আমরা। বেজমেন্টের নীচে ছিলাম আমরা তিনজন গা-ঢাকা দিয়ে। তাছাড়া টেপ-রেকর্ডারের রিসিভিং সুইচটা অন করে রেখে দিয়েছিলাম একটা দেয়াল-আলমারির ভেতরে। রেকর্ডে এখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা রক্ষা করা গেছে। যে রিভলবারটা তোমাকে দিয়েছিলাম সেটার সবক'টা গুলি বের করেই দিয়েছিলাম। তাতেই কাজ হবে, ধারণা ছিল আমার। যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল ও তোমার হাতে রিভলবার দেখে। সন্দেহ করতে পারে নি যে, ওতে একটাও গুলি নেই। ফলে ভয়ে মাথাটা প্রথম দিকে ঘুলিয়ে যায় ওর, এবং স্বীকার করতে থাকে এক এক করে সব কথা। আমাদের একটু ভুলের সুযোগে দ্রুত তোমাকে সাথে নিয়ে নিজের গাড়ীতে গিয়ে ওঠে ও আমরা বাধা দেবার আগেই আর একটু হলে তোমাকে হারাতাম আমারা চিরতরে। গাড়ীটা দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল। একটা ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছিল শুধু গাড়ীটাকে লেকের দিকে যেতে। তার কথার ওপর নির্ভর করেই গাড়ী ছুটিয়েছিলাম আমরা। ভাগ্য ভাল, ট্রাক-ড্রাইভারটা ঠিকই দেখেছিল। তোমাকে দিয়ে ও আত্মহত্যার স্বীকৃতি-পত্র লিখিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু এর দায়ে আমরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না ওর বিরুদ্ধে।

• হাসান একটু থেমে আরম্ভ করলঃ তোমার মুখে সব শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, রুহুল আমিন এবং তার মোমবাতি তোমাকে হয়ত হিপনোটাইজড অর্থাৎ সম্মোহিত করেছিল। কিন্তু প্রমাণ করব কিভাবে? ব্যাপারটা, সম্মোহনের মধ্যেও এমনই দারুণ এবং নির্মম যে লোকে তা এমনিতেই অবিশ্বাস করবে। তাই প্রমাণ ছাড়া চলতো না। প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি সরকারের নিরাপত্তা বিভাগে যতবড় চাকরীই করি না কেন, আমার বক্তব্য বলার সময়ও

প্রমাণ দাবী করা হতো। বরং বিশেষভাবে প্রমাণ চাওয়া হতো আমার ক্ষেত্রে। যাক, শেষ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেছে। এখন আমার সাথে সাথে আরো দু'জন পুলিশ অফিসার প্রকৃত ব্যাপারটা চাক্ষুষ দর্শন করেছে বা স্বকর্ণে শুনেছে—নতুন করে, দ্বিতীয়বারেরটা। টেপ-রেকর্ডারেও রেকর্ড করা রয়েছে তোমাদের সম্পূর্ণ কথাবার্তা। এবং এসব প্রমাণ এমনই বলিষ্ঠ যেগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না কোনো জুরি।

হাসান ধীরে ধীরে বলে চলেছেঃ তুমি যখন খুনটা করেছ তখন ছিলে হিপনোসিস অবস্থায়। কোনো স্বইচ্ছা ছিল না তোমার, কোনো বোধশক্তিও ছিল না। তোমার সচেতন মনটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে কেড়ে নেয়া হয়েছিল তোমার সব মানবিক ক্ষমতা, শক্তি, গুণ। এটাই হলো আসল পয়েন্ট। স্রেফ একটা অস্ত্র ছিলে তুমি প্রকৃত খুনীর হাতে। তোমার নিজের বোধ-শক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল, কোনো বোধ-শক্তিই সে-সময় ছিল না তোমার। দু'টো শরীর পরিচালিত হচ্ছিল একজনের নির্দেশ মোতাবেক—খুনীর। কিহে, ভয় পাচ্ছ নাকি খুব?

ঢোক গিলে দুর্বল কণ্ঠে বললাম ঃ নাহ্, মানে···।

হাসান মৃদু হেসে বলল ঃ ভাল হয় প্রথম থেকে যদি শুরু করি আমি। তুমি যাকে রুহুল আমিন হিসেবে চিনতে তার পরিচয় একটা নয়-তিনটে। তিন নামে সে পরিচিত। তুমি মাত্র একটা পরিচয় জানো। দ্বিতীয় পরিচয় ওর বহুবছর পূর্বে সে ছিল একজন পেশাদারী হিপনোটিষ্ট। এই দুর্লভ গুণ মহৎ কোনো কাজে লাগাবার মতো পরিবেশ পায়নি ও। সে ইচ্ছাও ছিল কিনা জানা নেই। সস্তা দরে থিয়েটার হলে ও ওর যাদুকরী ক্ষমতা প্রদর্শন করত দেশে-

বিদেশে সর্বত্র। 'বাহবা' সার্কাসের নাম এখনও শোনা যায়, সেই সার্কাস পার্টিতেও তখন ছিল ও। ওর স্টেজ-নেম ছিল 'ওস্তাদ কেরামত মিয়া'। পুরোনো থিয়েটার পার্টির অনুষ্ঠান-সূচী খুঁজে বের করেছি আমি, তাতেই জানা গেছে ব্যাপারটা। তাছাড়া এই বাড়ীর গুদাম-ঘরে প্রাপ্ত পুরোনো দিনের কাগজপত্রও তা প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে দুর্লভ একটা ক্ষমতা ছিল ওর হিপনোটাইজড করার নির্দিষ্ট কোনো কিছুর ওপরে। কিন্তু সব ব্যাপারের মতোই, ক্ষমতাটা তার শর্ত নিরপেক্ষভাবে কাজে লাগার নয়। শুধুমাত্র, বিশেষ ধরনের লোকেরাই অপেক্ষাকৃত সহজে প্রভাবিত হতো—তাই হয়। ভাল কথা, রুহুল আমিনের তৃতীয় পরিচয়টা বলি। অনুমান করতে পার কি, রহমান?

সম্ভবতঃ মিসেস্ কায়েসের স্বামী? মিঃ কায়েস?

ঠিক তাই। কায়েস আহমেদই আসলে রুহুল আমিন। বহুবছর আগে থিয়েটারে থিয়েটারে সম্মোহন বিদ্যার কেরামতি দেখিয়ে কায়েস আহমেদ সুনাম অর্জন করে পরিচিত হয়েছিল ওস্তাদ কেরামত মিয়া নামে। বেশ পয়সা রোজগার করত ও। সেই পয়সা কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসায় নেমেও ধীরে ধীরে বেশ পয়সা করে ও। টাকা-পয়সার সাথে দেখা দিল সম্মানবোধ। সম্মানবোধের খাতিরে সম্মোহন বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে লাগল ও ব্যবসার পিছনে পুরোদমে। প্রচুর টাকা করল ও। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল, তবু বিয়ে করল। তাও করবি তো কর, ওর চেয়ে অর্ধেকেরও কম বয়েসের একটা কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করে বসল ও। বিয়েটা করেছিল মেয়ের চাচাকে টাকার লোভ দেখিয়ে, এবং মেয়েটার আর কেউ ছিল না বলে। এভাবে, এতো কম বয়সের মেয়েকে বিয়ে করেই চরম ভুল করল ও। কেন না, বিয়ের আগে থেকেই ওর স্ত্রীর

প্রেমিক ছিল একজন। বিয়ের পর, যখন ওর স্ত্রী মিসেস্ কায়েস নামে পরিচিতা তখন সেই প্রেমিকপ্রবর আবির্ভূত হলো ওর সুভানুধ্যায়ীর ছদ্মবেশে। মকবুল হোসেনকে দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিল মিসেস্ কায়েস স্বামীকে। মকবুল হোসেন তখন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। বেকার। পূর্ব-প্রেমিকার স্বামী বড়লোক দেখে লোভ হলো তার। প্রেমিকা তো তার মতেই আছে, শুধু স্বামী বেচারার মন জয় করা। মকবুল হোসেন যেচে পড়ে ভাল সম্পর্ক তৈরী করে নিল কায়েস আহমেদের সাথে। এদিকে ভিতরে ভিতরে চলতে লাগল পরকীয়া প্রেম। কিন্তু অন্যায় আর কতদিন চাপা থাকে, বল? মনে মনে সবই টের পেল কায়েস আহমেদ। কানা-ঘুষা হয় আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে, ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে থাকলে মকবুল হোসেন আর তার স্ত্রীর নাকি হাত-পা গজায় নতুন করে। বেপরোয়াভাবে দিন কাটায়, যা ভাই-বোনের সম্পর্কে সম্ভব নয়। সতর্ক হলো কায়েস আহমেদ। প্রকৃত সত্য জানার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই সব জানতে পারল ও। তার অল্পবয়স্কা স্ত্রী এবং মকবুল হোসেন প্ল্যান করছিল—এবার কায়েস আহমেদ ব্যবসা উপলক্ষে বার্মায় গেলেই ওরা দু'জন সব টাকা-পয়সা, গহনা-গাটি নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাবে—ওদের সব কথা ওত পেতে শুনে ফেলল কায়েস আহমেদ।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করল হাসান: ষড়যন্ত্র শুনে মাথার রক্ত গরম হয়ে গেল কায়েস আহমেদের। স্বাভাবিক। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী এবং প্রাণের শত্রু মকবুল হোসেনকে হত্যা করবে সে—সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু নিজের হাতে খুন করলে নিজেকেও খুন করা হয় ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে। কিন্তু ভাবনা কি, সে তো হিপনোটিজম জানেই। প্ল্যান ঠিক করে ফেলল কায়েস আহমেদ। বার্মায় যাবার কথা ছিল

আগে থেকেই। বার্মায় যাবার নাম করেই বাড়ী থেকে বের হলো ও। কিন্তু চিটাগাঙ ছেড়ে গেল না ও, বার্মায় তো নয়ই। গিয়েছিল অবশ্য পরে। বাড়ী থেকে বের হয়ে তোমাদের বাড়ীতে নাম বদলে একটা রুম ভাড়া নিল ও। রুমিং-হাউস, ফলে নানা রকম লোকের বাস। লোক বাছতে শুরু করল ও। পরীক্ষা ক'র দেখতে লাগল কাকে দিয়ে তার কাজ উদ্ধার হবে, করানো যাবে। তোমাকেও পরীক্ষা করল ও। এবং দেখল তুমিই হচ্ছ যোগ্য লোক ওর কাজের জন্যে। সে ভুল লোক বাছেনি তা গতকালও প্রমাণ হয়ে গেছে। তুমি সাবধান থাকা সত্ত্বেও সম্মোহিত হয়েছিলে দ্বিতীয়বার। একটা কথা, ও কিন্তু কোনো দিন তোমাকে পুলিশে দেবার কথা ভাবত না। পুলিশ তোমাকে খুঁজে পাক বা না পাক, তাতে কিছু যেত আসত না ওর। খুনী হিসবে তুমিই প্রমাণিত হতে। শুধু নিজে কিছু জানতে না পারতে যদি তুমি তোমার দ্বারা সংঘটিত কাজগুলো সম্পর্কে, তাহলে সন্তুষ্ট থাকত ও।

হাসান খালি পেটেই সিগারেট ধরাল, শুরু করল আবার: যা ঘটেছে বলে মনে হয় তা দেখে পুলিশ যাকে খোঁজবার কথা সে হচ্ছ তুমি। সব প্রমাণই নির্দেশ করবে, তুমি খুন করেছ। কায়েস জানত তাকে কখনও দায়ী করা সম্ভব হবে না। ও তোমাকে গাড়ীতে করে এখানে নিয়ে এসেছিল, কেননা তুমি গাড়ী চালাতে জান না। কিংবা সম্মোহিত অবস্থায় গাড়ী চালানো সম্ভব কিনা, জানা নেই আমার। হিপনোটিজম সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না আমি।

আমার মনে একটা প্রশ্ন রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা, তুমি আমাকে রিভলবার দিয়ে আয়না লাগানো রুমে রেখে গেলে, তারপর এলো রুহুল আমিন বা কায়েস আহমেদ। কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে

ও সেই সময় আসবে ?

তোমাকে দিয়ে কাজটা সমাধা করার পর কথামতো বার্মায় চলে গিয়েছিল ও, সম্ভবতঃ পরদিনই। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে স্ত্রীর নামে—গতকাল সেই টেলিগ্রাম ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী পান। আমি তখন ওঁর সাথেই ছিলাম। দেখলাম টেলিগ্রামটা। সেই মতো পরিকল্পনা করেছিলাম আমি।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। পরদিন সকালে অমন পুংখানু-পুংখভাবে হত্যার দৃশ্যটা কিভাবে স্মরণ করতে পারলাম আমি, হাসান ? বিশেষ করে ওদের দু'জনার মুখের চেহারা ?

কায়েস আহমেদের কন্ট্রোলিং ক্ষমতা শতকরা একশ' ভাগ কার্য-করী হয় নি। কখনো তা সম্ভব কিনা জানা নেই আমার। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা নিশ্চয়ই তোমার সচেতন মনে মৃদুভাবে ছায়া ফেলেছিল, পরদিন তোমার স্মরণশক্তি সেই কথা নাড়াচাড়া করতে করতে মনের ভিতর থেকে বের করে এনেছিল। যেমন স্বপ্ন দেখলে হয় আর কি। আর ব্যাপারগুলো তোমার অচেতন মনে ঠাঁই করে নিয়েছিল। যদি বাস্তবে সেই জিনিসগুলোর সংস্পর্শে তুমি না আসতে তাহলে অচেতন মন চাপা দিয়েই রাখত তা মৃত্যু পর্যন্ত গুপ্তধনের মতো সেই সরু মতো গলির কথা, গলির মুখে দু'টো ল্যাম্প পোস্ট, দরজার স্প্রেয়ার চাবি রাখার বাক্স, হলের লাইট-সুইচ, ইত্যাদি সব তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র সে জায়গায় গিয়ে পড়েছিলে বলে। যাই হোক, যা বললাম তা আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা, এর বেশী কিছু বোঝার বা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।

কেন আমার মনে হয়েছিল যে, যুবতীটি আমার পরিচিতা, অথচ চিনতাম না যখন ? জায়গাটাকেও মনে হচ্ছিল পরিচিত, কেন ?

ওসব চিন্তা তোমার ছিল না, ছিল কায়েস আহমেদের কায়ে আহমেদের হয়ে তোমার মাথা কাজ করছিল।

আমি এখন তৈরী ইন্সপেক্টর গাউস চৌধুরী এবং হেদায়েত খান চলে গেছেন আমাদেরকে কথা বলতে দেখে। ওরা হয়ত ভাল মনে করেছে হাসানের সাথে আমার যাওয়াটা। এবং হাসান আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা সহজ করে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছে। ইন্সপেক্টরও বলে গেছেন, যখন হোক ও.কে সাথে করে নিয়ে আসবেন, মিঃ রহমান।

আধ ঘণ্টা পর আমরা দু'জন বেরিয়ে পড়লাম বাড়ীটা থেকে। আমি জানি, আমাকে হাজতে থাকতে হবে অল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু ভয়ের কিছু দেখছি না ওতে।

থানার সম্মুখে গাড়ী থামিয়ে হাসান প্রশ্ন করল: ভয় পাচ্ছ নাকি হে?

একটু পাচ্ছিলাম, যেমন দাঁত তুলতে বা ভাঙা পা ঠিক করতে যাবার সময় পায় মানুষ, তার চেয়ে বেশী নয়। জানা আছে, কাজটা ঘটবেই এবং ঘটার পর পরম আরাম পাওয়া যাবে। বললাম স্বীকার করে এবং হাসার চেষ্টা করে: সামান্য।

সব ঠিক করে দেয়া হবে।

প্রতিজ্ঞা করল ও। গাড়ী থেকে নেমে আমার কাঁধে হাত রেখে যোগ করল: সবটুকু সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। নিয়ম অনুযায়ী ফর্মালিটিগুলোও হয়ত পালন করতে বলা হবে না তোমাকে।

একসাথে গেটের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

———